১ ম খণ্ড] ১২৭৮ সাল [১০ ম সংখ্যা।

শ্রীমান ভক্ত বৃন্দ কল্যানবরেষু।

বৎসগণ ; তোমরা নরলোক; অল্পেই ব্যাকুল হইয়া ওঠো। দেব চরিত্র বুঝিতে পারো না, দেবতার লীলা তোমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, সেই জন্য 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই স্বর্গীয় বাক্যের সম্মান ইহলোকে তোমরা রক্ষা করিতে পারো না। তবে আমার দুর্ম্মতি; নহিলে এখানে সাধে সাধে আবির্ভূত হইলাম কেন ?—সেই দুর্ম্মতির ফলভোগ স্বরূপ তোমাদের কাছে আমিও কৈফিয়ত দিতেছি।

আমি কিছুদিন অবধি তোমাদিগকে দেখা দিতে যে এত শৈথিল্য করিতেছি তাহার অনেক কারণ আছে। যখন প্রথম আমি অবতীর্ণ হই, তখন আমার স্বর্গীয় বুদ্ধিতে এই ধারণা ছিল, যে নর লোকেও বুঝি প্রকৃতি দেবলোকেরই মত। কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম যে দেবচিত্তেও ভ্রমের স্থান হইয়া থাকে। অতএব নরলোক ভালো মত চিনিবার জন্য এত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাই এত বিলম্ব। দুঃখিত হইও না, বিলম্বে তোমাদের ক্ষতি নাই, লাভই আছে। এত দিনকি দেখিলাম, এত বিলম্বে তোমাদের কি লাভ, সবিশেষ জানাইতেছি, অবধান করো।

সাধরণতঃ একটা কথা জানা গিয়াছে যে এ পাপ পৃথিবীতে অনেক পাষণ্ডের দোষে অনেক ভক্ত মারা পড়ে। তুমি আমার পরম ভক্ত, সেবক যথা সময়ে

ভক্তি পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে আমার পূজা দিয়া হা দেব হা দেব করিয়া আমাকে ডাকাডাকি করিতেছ; এ দিকে তখন আমি এক পাষণ্ডের ছলনায়, স্তোক স্তবে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই পাষণ্ডের আড্ডায় ত্বরিতানন্দের আশ্বাসে বসিয়া আছি। তাহার দোষে তুমি ফাঁকি পড়িলে; শিরে করাঘাত করিয়া আমাকে ভোলানাথ ভাবিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলে। বৎস, দোষ আমার নহে, দোষ তোমাদের কপালের, আর দোষ এই দুষ্ট সংসর্গের। সকলে যদি ন্যায্য সময়ে ন্যায্য গণ্ডা ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে তেমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না, আমাকেও কথা সহিতে হয় না। আমি ত করিবই, তোমরাও পাষণ্ড দলনের চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হও।

আর একটা সাধারণ কথা টের পাইয়াছি। নরলোক যে বানর লোকের সাক্ষাৎ বংশধর এটা অনেকেরই এখন বিশ্বাস হওয়াতে, ব্যবহার টা তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মধ্যে যিনি কথক, তিনি উচ্চ কাষ্ঠাসনে তোমাদের অবোধগম্য কিচির মিচিরে তোমাদিগকে উপদেশাদি দিয়া থাকেন, তোমরাও দাঁত দেখিয়াই পরম তুষ্ট। লাভে হইতে এই দাড়াইয়াছে যে আমার দেব ভাষার অনেকটাও তোমাদের বুদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। প্রমাণ তোমাদের সাধারণী তোমাদের সঞ্জীবনী। আর সাধারণীর কথা, আজি কাল তোমাদের বেদ। বৎসগণ, ভ্রান্তি পরিহার করো, ধৈর্য্য শিক্ষা করো, ব্যস্ত হইও না। তোমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষেরা সাত শ বৎসর পাষাণে বুক বাঁধিয়া ধৈর্য্য দেখাইয়া আসিতেছেন, তোমরা আর মাসেক দুমাস পারিবে না? ধিক্ তোমাদিগকে!

সাধারণ কথা আর একটা বলিয়াই বিশেষ কথার অবতারণা করা যাইতেছে। যাহারা ভাবুক, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালা কথার ইজ্জত নাই, বাঙ্গালীর সময় জ্ঞান নাই, বঙ্গে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই, এই সকল তত্ত্বের প্রমাণ দেওয়াই পঞ্চানন্দের

উদ্দেশ্য। তাহা সফল হইয়াছে। পঞ্চানন্দ সকলে আদর করিয়া পড়িতে চাহে না, পঞ্চ পড়ে, চারইয়ারি পড়ে, বাঁদরামি করে,—কিন্তু বাঙ্গালা কথার তিনকুলে কেহ নাই, পঞ্চানন্দের আদর নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর সময় জ্ঞান নাই, ইংলিসম্যানের দাম অগ্রিম সকলেই দেয়, কিন্তু বঙ্গদর্শন বান্ধবের কথা কাহারও মনে থাকে না, কাজে কাজেই আষাঢ়ীয় দর্শন ভাদ্র মাসেও তাহা পড়িতে পারেন না। আর প্রতিজ্ঞায় যে দৃঢ়তা নাই, তাহা বলিতে হইবে কেন? যে দিন স্বয়ং পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সময়ে সময়ে নিয়মিত রূপে তিনি দেখা দিবেন সেই দিনই লোকের দিব্য জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। বৎসগণ অদ্য হম্বা রবে রোদন করিলে কি হইবে?

যাহা হউক, বিশেষ কথা এখন বলা যাউক; আমি এত দিন কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, একে একে সে সব বলা যাউক। তোমরা ফল ধরিয়া উপবিষ্ট হও।

বিশেষ কথা।

১। রাজদর্শন।

যখন সংসার দেখিতে আমার বাসনা হইল, তখন উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত দেখাই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। নরলোকে রাজা এবং রাজপদই সর্ব্বোচ্চ জানিয়া আগে রাজদর্শনটাই উচিত বিবেচনা করিলাম।

কিন্তু গোড়াতেই গোল বাধিল;—ভারতে রাজা কে? যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই, সেই এত মহারাজ, রাজা, রাজড়ার খবর দেয়, যে ভাবনায় দেব-প্লীহাও চমকিয়া ওঠে। ভূমি শূন্য মহা-রাজ, হিন্দু বিধবা অপেক্ষা হীনতর, কারণ জীবনের কিয়ৎকালের নিমিত্ত বেতন ভোগী রাজা—এসব এত অধিক যে আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; মনে হইল তবে বুঝি ভূভারতে সত্য রাজা নাই, সমস্তই অরাজক।

শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে আমার ধারণাটা নিতান্ত অমূলক নয়; এ মুলুকে আসল রাজা নাই, রাজ প্রতিনিধি মাত্র

আছে। তথাস্তু! আমি সেই প্রতিনিধি হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

প্রতিনিধি দেখিতে কলিকাতা গেলাম! প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ততোধিক প্রকাণ্ড ফটক, যেন হা করিয়া জগৎ সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত; আর সেই ফটকে ব্রহ্মাস্ত্র সজ্জিত যমদূত স্বরূপ প্রহরী! দেখিয়া একটু ভয় হইল, ভাবনাও হইল। এ প্রহরী কেন? তবে কি রাজায় প্রজায় মৈত্রভাব নাই?

সাহস করিয়া প্রহরী পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, সেই প্রান্তর প্রতিম প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম। প্রহরী বোধ হয় কোন আত্মীয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমাকে তদবস্থ দেখিয়া শ্বশুর-কুল-সম্ভূত কুটুম্ব বিশ্বাষে সম্বোধন করিল। আমি অবাক্! প্রহরী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত আমার গলদেশে সুবিন্যস্ত করিয়া ভক্তি ভাবে 'যাও' বলিয়া আমাকে বহির্দ্দেশের পথ দেখাইয়া দিল। আমি ভাবগতিক না বুঝিতে পারিয়া, তাহার ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া প্রবেশ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছি, যে প্রতিনিধি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রহরীর চিত্তটা খুব ভক্তিশীল বটে! কিন্তু নীচ বৃত্তি অবলম্বন করাতে তাহার হস্ত কিঞ্চিৎ কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার জন্য আমার দুঃখ হইল।

যাহা হউক, একবার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা কাণ্ডের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, দেখা গেল যে আলয়ের বাস যোগ্যতা যত হউক না হউক বংশ বাহুল্য কিঞ্চিৎ ভীতি জনক! সরল, সকঞ্চী, স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বাঁশ প্রতিনিধিকে নিয়ত যেন

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"

স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিয়ত বিরাজ করিতেছে। প্রতিনিধিত্ব বড় সুখের চাকরি বলিয়া আমার বোধ হইল না।

বুঝিয়া সুঝিয়া স্থির করিলাম যে এমন অসুখী প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা না করাই ভালো; জিজ্ঞাসাবাদে টের

পাইয়াছি যে প্রতিনিধির ভাবনা চিন্তা ত আছেই, তাহার উপর তিনি দশ চক্রে নিপতিত পুতুল, নিজে হাত পা নাড়িয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নিরেট অজ্ঞতা নিবন্ধন মুখ-ফোড় হইয়া কিছু করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ও হয় না। যাহার পরমায়ু পাঁচ বৎসর মাত্র, সে বেচারা করিবে কি? দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ের তরঙ্গ উঠিতে না উঠিতে, তাঁহার হিন্দু রমণীর বাল্য বৈধব্য উপস্থিত হয়।

অতএব এখন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আলাপ করাই হইল না।

বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

ভুলু বাবু খুব ধুমধামের সহিত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন; তাঁহার ব্যয় বিধান দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ভুলু ঈষৎ লজ্জিত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনারা অপরাধ নেবেন না; আমি পিতৃহীন, তাই আপনাদের যথোচিত সমাদর কর্‌তে পার্‌লেম না। আজ্ যদি বাবা থাক্‌তেন তাহা হইলে এর দশ গুণ ক্রিয়া কর্‌তে পারতাম, বাবা সন্তুষ্ট হতেন, আমার ও জন্ম সার্থক হ'ত।"

বয়সের বিচার।

ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন তখন বলিতেছেন "মুহু-র্মুহু বয়স কমিয়া যাইতেছে, অতএব অনিত্য সংসারের চিন্তায় সতত নিরত না থাকিয়া হরি চরণে শরণ লও"। জড়বুদ্ধি ডাক্তার বলিতেছেন, "প্রতিক্ষণে বয়স বাড়িতেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বাড়িবে, তাহার পর সব ফুরাইবে; অতএব নিয়ম পূর্ব্বক এখন খাও দাও, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেহ বজায় রাখিতে পারা যায়।

এখন সমস্যা শক্ত, প্রকৃতপক্ষে বয়স বাড়ে কি কমে?

পঞ্চানন্দ এতদ্বারা জানাইতেছেন যে, যিনি যাহা বলুন, বাস্তবিক বয়স বাড়েও না, কমেও না। যাহার যখন যত বয়স তখন ঠিক ততই বটে; কমও নয় বেশীও নয়।

তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে এরূপ বয়সের হ্রাস বৃদ্ধির সমস্যা উঠিল কোথা হইতে? উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বয়সের হ্রাস বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু বয়স স্থিতিস্থাপক পদার্থ, টানিলেই বাড়ে আবার ছাড়িয়া দিলেই কমিয়া যায়। এ হিসাবে বয়স তিন প্রকার; যথা, (১) যাহা বাড়েও না কমেও না তাহা আসল বা ঠিক বয়স। ইংরেজী নাম real age.

(২) যাহা বাড়ে তাহা পেশাদারী বয়স; পেশাদার হইতে হইলে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা

দেখান আবশ্যক, সেই জন্য টানিয়া বয়স বাড়াইতে হয়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে professional age.

(৩) যাহা কমে, তাহাকে বলে চাকরের বয়স। না কমাইলে অনেককে পেনসন লইতে হয়, সেই জন্য বয়স কমিয়া যায়। ইংরেজীতে বলে official age.

(৪) আর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলে যে বয়স কমে, তাহাকে বলা যায় গরজের বয়স অথবা selfish age ; অতএব ধর্ত্তব্যই নহে।

অন্যায় দেখিলেই রাগ হয়।

মুখুয্যেদের বাড়ী কালীপূজা দেখিতে গিয়া সেখ দবীরুদ্দীন হোঁচোট খাইয়া বলিল—

"শালার মুকুয্যে পির্ত্তি বছরই আঁদারে কালী কর্‌বে, ভুলেও যদি একবার জোছনায় কর্‌লে!"

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। কে সর্ব্বাপেক্ষা লগ্ন মুহূর্ত্ত ঠিক গণনা করিতে পারে?

উত্তর। পাওনাদার; তাহাকে যখন আসিতে বলিবে, সে ঠিক তখনই আসিয়া উপস্থিত।

প্রশ্ন। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাগ্মী কে?

উত্তর। যুবতীর চক্ষের জল।

নবগব নরের অভ্যর্থনা।

আবাহন।

পঞ্চানন্দ ভাসি আজি আনন্দ সাগরে,
করিছে আহ্বান দেব পবিত্র অন্তরে।

স্বাগত।

কি হেতু ত্যজিয়া তুমি
ব্রিটনে জনম-ভূমি,
কি আশে আসিলে বলো ঘামাইতে মাথা?
চাহো কি জানিতে,—মূক কিসে পায় ব্যথা?

পরামর্শ।

যত ধর্ম্ম, যত ভাষা মর্ত্ত্যলোকে আছে।
একাধারে সব পাবে ভারতের কাছে॥

অভয়দান।

ভাবিলে, ভারত রাজ্য-
শাসন সামান্য কার্য্য;
হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসীক, ইস্‌লামী খৃষ্টান,
কাহারে ভারত ভোলা দেয় নাই স্থান?

উপদেশ।

গৌরবের ইতিহাসে আছে এক নাম,
—হুমায়ুন;—করো তারে উদ্দেশে প্রণাম।
ভাসিয়া নয়ন জলে
পুত্রে ধরি বক্ষঃস্থলে,
বলে'ছিল আকবরে পণ্ডিত প্রধান——
"শাসিবে হিন্দুর মতে এই হিন্দুস্থান।"

শাসন।

এখন কি আর কহিব?
দশ মুখে জয়, দশ মুখে ক্ষয়—
আখেরে বুঝিয়া লইব।

অভ্যর্থনা ।

দরকার বিজ্ঞাপন।

চাই———একটী লেজ!

পঞ্চানন্দের একটী প্রিয়পাত্র আছে। রূপ, যৌবন, ধন, মান, আশা, আশয়, যাহা কিছু করিয়া দিতে হয় পঞ্চানন্দ ইহার সকলই করিয়া দিয়াছেন। প্রিয় পাত্রটী একটী পোষা বাঁদর।

বাঁদরামি যত রকম হইতে পারে, প্রিয়পাত্র তাহার সমুদয় প্রদর্শন করিতে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। সংসারে যে লেজ পাইলে অনেকেই বাঁদর জন্ম সার্থক মনে করে, সে উপাধি লেজও প্রিয়পাত্রের পর্য্যাপ্ত পরিমানে আছে। বিধাতা পুরুষের কলমে, আঁটকুড়ার কপালে, পঞ্চানন্দের সুপারিষে যাহা লেখান সম্ভব, তাহা সমস্তই লেখান হইয়াছে। এমন কি, প্রিয়পাত্রকে দেখিয়া সকলেই বলে—“আহা! এটী রাজপুত্তুর বিশেষ!” লোকে বলে বটে, কিন্তু পঞ্চানন্দের ষোলো আনা সুখ ইহাতে হয় না; কারণ, তাঁহার পোষা বাঁদর যে সে নাচাইয়া বেড়ায়। প্রিয়পাত্র যখন উচুর উপর বসিয়া থাকে, তখন নীচে দাঁড়াইয়া কেহ হাত তালি দিলেই মনের মত বাঁদরামিটি দেখিতে পায়। দুঃখ এই যে, অন্তরালে থাকায় পঞ্চানন্দ তখন প্রিয় পাত্রকে আয়ত্ত করিতে পারেন না। ইহার একমাত্র কারণ,—প্রিয়পাত্রের একটী লেজের অভাব!

অতএব এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, যদি কেহ এই প্রিয় পাত্রের উপযুক্ত একটি লেজ সংযোগ করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে পঞ্চানন্দ তাঁহার নিকট বিনিমুলে কেনা রহিবেন অর্থাৎ তাঁহাকে একখণ্ড পঞ্চানন্দের অবৈতনিক গ্রাহক শ্রেণীভূক্ত করিয়া লওয়া যাইবেক।

নির্দোষ প্রার্থনা।

রামহরি (ক্রুদ্ধ ভাবে)—“ওরে বেটা তুই উচ্ছন্নে যা”।

বিষ্ণু (ভক্তি ভাবে)—“অনুগ্রহকরে যদি আগে আগে পথটা দেখিয়ে যান ত ভালো হয়। নইলে চিন্তে পার্‌ব না।”

সময়োচিত প্রস্তাব।

অমেরিকাতে ডাক্তার টানর স্বয়ং চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আহার একটা বদ অভ্যাস বা কুসংস্কার মাত্র; বস্তুতঃ আহার না করিলে সংসারের কোন ও ক্ষতি নাই, বরং উপকার আছে।

ভারত বাসী এ সহজ কথাটা কিন্তু বুঝিতে পারে না; সেই জন্য লাইসেনের টাকা কাবুলের যুদ্ধে খরচ হইতে দেখিয়া ইহারা মহা গণ্ডগোল করিতে থাকে।

সুখের বিষয় এই যে সমুদয় ভারত বাসী এ প্রকার ভ্রান্ত নহে। কারণ যাহারা দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র চালায়, তাহাদের অধিকাংশই ডাক্তার টানরের চৌদ্দ পুরুষ;—ইহারা পেটেত খাইতে পায়ই না, অধিকন্তু পিটে খাইয়া থাকে।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া পঞ্চানন্দ প্রস্তাব করিতেছেন যে কাবুল যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া মধ্যে মধ্যে কাবুলীদিগকে লাইসেনের তহবিল হইতে টাকা যোগাইয়া লড়াই করাইয়া লওয়া হউক, এদিকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য একটা অনাহার বিধায়িনী সভা সংস্থাপিত হউক, ডাক্তার টানর তাহার সভাপতি, দেশীয় সংবাদ পত্রের লেখকেরা সভ্য, এবং হিন্দু বিধবারা সভ্যা নিয়োজিত হইয়া ভারতে অনাহার শিক্ষা দেওয়া হউক। তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত সভার ব্যয় বিধানও অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ পেটের দায় না থাকায়, একটা মোটা খরচ একেবারেই লাগিবে না আর ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, কাপড় পরাটা ক্রমে উঠাইয়া দিলেই চলিতে পারিবে।

ভরসা করি ভারত সভা এপ্রস্তাবের পোষকতা করিয়া চসার, আডিসন্, ডি কুইন্সি বা মেকলের ইংরেজীতে পার্লিয়ামেণ্ট বরাবর এক দরখাস্ত করিবেন, এবং এ বিষয়ের আন্দোলন জন্য বিলাতে এক জন প্রতিনিধিও পাঠাইবেন। এখন লিবেরাল সম্প্রদায় প্রবল,

সুতরাং আশার খর্ব্বতা হইবার কোনই হেতু দেখা যায় না।

আক্কেল আছে।

সেকেলে সেরেস্তাদারেরা যে ঘুষ খাইত তাহা অন্যায় বলা যায় না কারণ তেমন হুসিয়ার লোক চারগুণ বেতন দিয়া আজি কালি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এক দিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে অনেক বেলায় দেরি করিয়া সেরেস্তাদার আদালতে উপস্থিত। জজ্ সাহেব বলিলেন এ বড় বেজায় তুমি এত দেরি করিয়া কাচারি আসিলে কেন?

সেরে। হুজুর পথে যে কাদা তুপা এগিয়ে আসিতে তিন পা পেছিয়ে পড়ি কাজেই একটু গৌণ হইল।

জজ্। যদি তুপা এগুতে তিন পা পেছিয়ে পড়্লে তবে পৌঁছিলে কেমন করে? তোমার এ মিথ্যা কথা।

সেরে। দোহাই ধর্ম্ম অবতার মিথ্যা না যখন দেখলাম নেহাত আসা যায় না, তখন কাছারির দিকে পেছন ফিরে নগর দিকে সম্মুখ করিলাম।

জাগ্রতের স্বপ্ন।

নাস্তিকের পত্র।

মহাশয়,

আমি গত রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নটী ভীতি ব্যঞ্জক, কিন্তু তথাপি কৌতুকাবহ। আজি কালি লোকের স্বপ্নাদিতে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে; তাহারা মনে করে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নহে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু তথাপি আমি ভরসা করি, যে, আমার নিম্ন লিখিত স্বপ্নটীর উপর সকলেই আস্থা প্রদর্শন করিবেন।

আমি গত রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। ক্রমে নিদ্রাবেগ হ্রাস হইতে লাগিল; ক্রমে স্বপ্ন দেবী আসিয়া ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হইলেন। এই সময়ে দেখিলাম যেন ঈশ্বর একটী বৃদ্ধ পুরুষের বেশ ধরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া আমার হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক অতি মৃদু স্বরে বলিল "একটী কথা শুনিয়া যাও; আমার নাম ঈশ্বর, আমি

তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি ; তোমরা তোমাদিগের পিতামাতার মুখে আমার নাম শুনিয়া থাকিবে।” আমি কিছু মাত্র ভীত বা চমকিত হইলাম না। পিতা মাতার মুখে ইহার নাম শুনিয়াছি সত্য ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও কতকগুলি নব্য-যুবা এই ব্যক্তির সম্পর্কে অনেক বাদানুবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহাকে চিনিতে আমার কোন কষ্ট হইল না ; এবং স্বভাবতঃই ইহার সম্পর্কে কিছু জানিবার জন্য কৌতূহল থাকাতে ইহার অনুরোধ রক্ষা করিতেও কোন আপত্তি থাকিল না। আমি উহার কথায় জাগ্রত হইলাম, এবং এক নিভৃত প্রদেশে গিয়া বলিলাম “কি বলিবে, বল।” বৃদ্ধ বলিল “দেখ, কএকটী স্বভাব শিক্ষিত যুবক আজি কিছুদিন হইল, সত্যানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া অবশেষে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহারা প্রমাণ করিয়াছে, আমি নাই। কিন্তু কতকগুলি লোকে শিক্ষা ও কর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছে “আমি আছি”। এই সমস্ত বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য আমি তোমার নিকট স্পষ্ট ভাবে জানাইতেছি আমি বাস্তবিকই নাই। আমি আছি বলিয়া যাহারা বলে, তাহারা আমাকে বিশেষণের উপর বিশেষণ দিয়া এরূপ এক অদ্ভুত জন্তু করিয়া তুলিয়াছে যে, আমি আর লোক সমাজে আপনার পরিচয় দিতে সাহস পাই না। এক্ষণে জগৎ জানুক যে, আমি নাই। কুৎসিৎ তুলিকায় যেন আর আমি চিত্রিত হইনা। পাপ-মুখে যেন আমার নাম আর উচ্চারিত হয় না। যাহারা আমি নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি না। তাহারা অসরল নহে, কপটতার কদর্য্য আবরণে তাহাদের নেত্র কলুষিত হয় নাই। তাহারা সমাজের প্রতিকৃতি। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্য সমাজ সভ্যতার নামে যেরূপ অধঃপাতে গিয়াছে, তাহারা সেই অধঃপাত মস্তকে গ্রহণ করিয়া, তাহারই চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। যদি তাহাদের সিদ্ধান্তে কোন ভ্রম থাকে, তবে সে ভ্রম তাহাদের

নহে; তাহা সমাজের; সমাজের ভ্রমের জন্য তাহারা দায়ী নহে,—দায়ী তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। তুমি জগতে আমার এই আদেশ প্রচার কর, কিন্তু আমার নামে করিও না। তুমি তোমার নিজের কারণ প্রদর্শন করিয়া বল যে ঈশ্বর নাই; যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তবে বলিও তিনি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন, অথবা তাহার সৃষ্ট নিসর্গ ইহা শিক্ষা দিতেছে।”

আমি অদ্য প্রাতে উঠিয়া, কি উপায়ে এই সত্য জগতে প্রচার করিব, তাহা ভাবিতেছিলাম, কারণের পার্শ্বে কারণ বসাইয়া, এবং প্রমাণের উপর প্রমাণ স্থাপন করিয়া অবশেষে সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি। আমার কারণ এই—ঈশ্বর আছেন, এ কথার প্রমাণ নাই। তাহাকে দেখিনা, তাহাকে শুনিনা, তাহাকে স্পর্শ করিতে পাইনা; সুতরাং তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। যাহার প্রমাণ আছে, তাহা আছে; অতএব যাহার প্রমাণ নাই, তাহা নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই; অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।

কেহ হয়ত বলিবেন “ঈশ্বর নাই, তবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিল কে?” মূর্খ! মনুষ্য কি পশুর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; আর পশুই কি মনুষ্যের উদরে জন্মিয়াছে? মনুষ্যই মনুষ্যের জন্মদাতা, সুতরাং স্রষ্টা, এবং পশুই পশুর জন্মদাতা এবং স্রষ্টা, আমি উদ্যানে একটি কদলী বৃক্ষ রোপন করিলাম। কিছু কাল পরে তাহাতে আর একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। আমি পরিশ্রম করিয়াছি, বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে! এক্ষণে আমাকেও চিনিবেনা, বৃক্ষকেও চিনিবেনা; তুমি বলিবে উহার জন্মদাতা ঈশ্বর! অকৃতজ্ঞ! একের সন্তান অন্যকে দিয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ বই তোমার উপকার হইল কি?

তুমি হয়ত বলিবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে সমাজনীতি রক্ষা হইতে পারে না। আমি বলি, সমাজনীতি রক্ষা হউক কি গোল্লায় যাউক, তাহার জন্য মিথ্যা কথা বলিও না! অসত্যকে

ভিত্তি করিয়া, সেই ভিত্তির উপরে নীতি গঠন করিলে, সেই নীতি টিকিবে কেন ?

আমি উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া জগতে নাস্তিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসিলাম। পঞ্চানন্দ আস্তিক কি নাস্তিক তাহা আমি জানিনা। কিন্তু আমার ভরসা আছে যে, তিনি আস্তিক থাকিলেও, আমার প্রমাণে পরাভূত হইয়া অচিরে আমার শিষ্য হইবেন।* ইতি

বশম্বদ

শ্রীশাঃ——

নূতন না হইলেও জানাইবার কথা।

পূর্ব্বে অনেকেই "বাঁদরামি" দেখিয়াছিলেন সেই "বাঁদরামি" আবার বাগবাজারের কে কে প্রকাশ করিয়াছে। "বাঁদরামি" মন্দ নয় আমোদ আছে হয়ও অল্প খরচে। এখন অনুগ্রহ পাঠকবর্গের।

---

* ছোকরা খুব মজবুৎ! যে পঞ্চানন্দকে শিষ্য করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার অসমসাহসিকতা, উৎসাহ পাইবার যোগ্য; সেই জন্য ইহা কলেবরস্থ করা গেল।— পঞ্চানন্দ।

প্রাপ্ত।

মহাশয়,

রাজসাহী হইতে লাট লিটন্ সমীপে যে দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার একখণ্ড অবিকল নকল আপনার সমীপে পাঠাইতেছি; আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীঃ——

মহামহিম মহিমার্ণব, শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরাল লার্ড লিটন সাহেব—

সমীপেষু—

দরখাস্ত শ্রীপরমেশ্বর দাস, রাগেশ্বর ঘোষ সেখ ছনুমিয়া ও কম্পুমিয়া দিগর, আমলা মফস্বল আদালত। ২৪শে মে ১৮৮০।

আর সপ্তাহকাল মধ্যে সীমলা পর্ব্বতশিখরে রাজ মুকুট রাখিয়া আপনি বিশ্রাম করিবেন। স্বদেশ গমন করিলেও অস্ত-

---

*প্রেরিত পত্রের সত্য মিথ্যা ভালো মন্দের জন্য সম্পাদক (সাধারণ নিয়মানুসারে) দায়ী নহেন।

মিত রবি কিরণের মত আপনার কীর্ত্তির জ্যোতি ভারতে থাকিবে।

মান যাচাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য আপনি তুলার শুল্ক কমাইয়া দেন। পাছে অসাবধান বাঙ্গালীর ছেলেরা দায়ে এবং বাঙ্গালীর মেয়েরা বঁটীতে হাত কাটিয়া ফেলে তাই অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন বিধি বদ্ধ করেন। কি জানি বাঙ্গালা ভাষা মান গাছের মত বাড়িয়া উঠিয়া অল্প দিনের মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং বাঙ্গালা সরস্বতী পদে শৃঙ্খল না থাকার জন্য পাগলীর ন্যায় যথায় তথায় চীৎকার করিয়া বেড়াইতে থাকে, তাই ৯ আইন জারি এবং প্রচারিত করেন। এইরূপ আপনি কত না মঙ্গলের কার্য্য করিয়াছেন। ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনাকে এত সত্বর অকালে গমন করিতে না হইলে আপনি যে কি করিতেন তাহা কে বলিতে পারে?

সকলেরই প্রতি এইরূপ কৃপা দৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু শুনা যাইতেছে অধীনদের বেতন কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কাবুলে যুদ্ধ করিয়া আপনি অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। অরুণ-আলোক প্রকাশিত পদ্ম নেত্রে অধীনদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দয়াল চিত্তের পরিচয় প্রদান করত ধূম-কেতুর পুচ্ছের ন্যায় যুগ যুগান্ত স্থায়ী যশো-নিশান উড়াইয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।

যে সময় আপনাকে বিলাত যাইতে হইবে তখন পবনদেবের উৎপাতে অতল সাগর বক্ষে বিষম উৎপাত ঘটিতে থাকিবে। যে পুণ্যের বলে লোকে ঊর্দ্ধে স্বর্গে উঠিয়া যায়, সৎকার্য্য জনিত সেই পুণ্যের ছালা আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। জল মজ্জন আদি বিপদ ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না। অধিকন্তু গলদেশে সামান্য একটী পাপের ঝুলি থাকিলে লোককে ডোলার মধ্যেও ডুবিয়া মরিতে হয়। ভারতবাসীর আশীর্ব্বাদ রূপ অনুকুল কুলার বাতাসে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ নীত হইবেন।

বে বুনিয়াদী দরখাস্ত আপনি কখন শ্রবণ করেন না। সে দিন ভারতীয় বিদ্যা-বাগীশ সভার সভ্যেরা অন্যায় দরখাস্ত

করায় কোমল কর পল্লব দ্বারা তাঁদের কর্ণমূল কম্পিত করিয়া দেন। আমাদের আবেদন পত্রের হেতু নিম্নে লিখিত হইল। অবধান করিতে আজ্ঞা হয়।

অধীনেরা দুঃখী আমলা। মামলা এবং উকীল বাবুদের শীর্ষ শোভা সামলার দুর্গতি সহ অধীনদেরও দুর্গতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা হাকিম বাবুদের কিছু বেশী বেতন হওয়ায় অনেকে একটু বেশী ঘৃত ভোজন সুরু করিয়াছেন। কাজেই হাকিম বাবুদের গায়ের লোম কি না রোঁয়া উঠিয়া যাওয়ায় তাঁরা বেরোঁয়া হইয়াছেন। কাজেই অধীনদের গয়া অনুমেয়।

অধীনদের বেতন অল্প, কিন্তু পরিবারের সংখ্যা বড় অল্প নয়। মাগ, ছেলে, মাগের গর্ব্ভধারিণী এবং তস্য নন্দিনী সেই মাগের সহোদরা। অধিকন্তু আজকাল যেখানে ছেলে সেই খানেই পিলে, সুতরাং খরচ পত্রের অকুলান বশতঃ আহেলা মামেলাদের ট্যাকের পানে বক্র দৃষ্টি করিতে, মোক্তারদের সহিত জনান্তিকে কথা কহিতে এবং ভব্যযুক্ত হইয়া হাকিমদের পাশে সময়ে সময়ে বসিতে হয়। চকে চস্‌মা রূপ ঠুলি না থাকিলে ক্ষুধার দায়ে কখন কখন আদালতের কাগজ পত্র পর্য্যন্ত খাইতে হয়। সরলতার অনেক গুণ। সরলতা দয়া আকর্ষণ করে, তাই পাপ মুখে এই সমস্ত পাপ কথার উল্লেখ।

সরকারের কত দিকে কত যাইতেছে। কাবুলের যুদ্ধে হাজার পঞ্চাশ উটেই কত টাকা উঠিয়ে দিলে। হুজুরের সঙ্গীদের সীমলে পাহাড়ে ওঠাতে এবং নাবাতে কত টাকা না ব্যয় হইয়া থাকে। বড় লাট সাহেব বিলাত হইতে আসিবেন পাথেয় খরচ বড় বেশী নয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। কাহারো কাহারো মাসিক বেতন চার হাজারের উপর। ইঞ্জিনিয়ারী বিভাগের তো কথা নাই। নদীর পুলের কাঠ বড় বড় মাছে খাইয়া যায় নরম পাঁজা ছোট ছোট গো বৎসে খাইয়া ফেলে এবং লোহার গার্ডারে কুলিদের প্রশ্বাস বায়ুতে জং ধরিয়া

সত্বর নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে কত টাকা কত দিকে যাইতেছে। অধীনেরা গরিব। অন্যের মাথা খাইনে কেন, সরকারের ষোল আনা বজায় রাখি সতেরো আনা কাটি। অধীনদের বেতন কমালে অধীনদের মারলে কি হবে। কতকগুলি চুনো পুঁটী না মেরে একটা বড় কাতলা মারলে বোধ হয় অধীনেরা পরিত্রাণ পায় এবং কাহারো ক্ষতি বিশেষ হয় না।

ইংরাজ রাজ পুরুষগণ বিলাত হইতে এই দূর ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন। গায়ে কোট পান্টুলন এবং মস্তকে হ্যাট ধারণ করিয়া আসেন। কিন্তু "পাজী নিগার্ডদের শাসন করিতে যাইতেছি" এই ভাবটী টুপির নীচে মাথার ভিতরে করিয়া আনেন। অধীনেরা সেই শাসন ভাবের পোষণ করে। শ্বেত হাকিম গৃহিনীর সহোদর বলিয়া ডাকিলে পরিহাস মনে করি, বজ্জাত বলিলে চুপ করিয়া থাকি এবং সবুট পদাঘাত করিলে ক্ষণকাল পড়িয়া থাকিয়া পরে আপনার কার্য্য আসিয়া করি। পুরুষত্ব বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন এবং রাজ পুরুষবর্গের রাজত্ব করণ সাধ সুসিদ্ধ করি। এমন যে আমরা আমাদের রুটী-শ্রীবিষ্ণু—শাক ভাতের ভাগ কমাইলে কি হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

উৎকৃষ্ট মিমাংসা।

মধু বাবু, লোকে যে যা বলুক,—তোমাদের দক্ষিণ পাড়ার জয়কৃষ্ণ বাবু খুব চৌকোষ লোক নয়?" "আজ্ঞে তিনি যে সব কাণ্ড করেন! তা দেখে, চৌকোষ কেন বোধ হয় পঁচিশ কোশ।

উপসর্গ।

উমেশ। এই নশ্বর জগতে যাহারা অর্থী কিম্বা পণ্ডিত নহে তাহারা কি নামে অভিহিত হইবে?

রমেশ। অর্থী শব্দের কি অর্থ করিতেছ? অভিধানে অর্থী মানে ভিক্ষুক।

উমেশ। ব্যাকরণের সুত্র ধরিলে অর্থী শব্দের অর্থ ধনবান। অর্থ+ইন্।

রমেশ। বটে !! তবে তাহারা সামান্য।

উমেশ। যাহারা অর্থী হইয়া কোন সৎকার্য্য না করিল তাহাদিগকে কি কহিবে?

রমেশ। প্রসামান্য।

উমেশ। আর যাহারা অর্থী ও পণ্ডিত উভয় হইয়া কোন কার্য্য না করে?

রমেশ। তাহারা প্র-পরা সামান্য।

উমেশ। আর যাহারা অর্থী, পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ হইয়া কোন কার্য্য না করে?

রমেশ। প্র-পরা অধি সামান্য।

উমেশ। অর্থী পণ্ডিত ও পদস্থ হইয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হয়?

রমেশ। তাহারা প্র-পরা অধি নির্ সামান্য। তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিতেছ?

উমেশ। পূর্ত্ত-বিভাগের অধিনায়ক স্যার এণ্ড্রু ক্ল্যার্ক।

রমেশ। যাঁহার বাৎসরিক বেতন আশি হাজার? তুমি যাহা বলিতেছ তাহা নয়। প্রথম বৎসরে তিনি প্রার্থী, দ্বিতীয় বৎসরে পরার্থী, তৃতীয় বৎসরে অধ্যর্থী, চতুর্থ বৎসরে প্র-পরা অধি ও নিরর্থী হইয়া, এই পঞ্চম বৎসরে দূর হইলেন।

কারে পড়িলে সবাই টিট্।

উপকথাটা অতীব নীচ, যাহার সঙ্গে থাকে তাহাকেও নীচ, ক্ষুদ্র ও ঘৃণার্থে পরিণত করিবে। দৃষ্টান্ত—উপপতি, উপপত্নী, উপ-দেবতা, উপকথা, উপগ্রহ, উপদ্রোহ ও উপ-মাতা ইত্যাদি কিন্তু যখনই এই উপশব্দ কারে পড়ে, তখনই মনুষ্য জীবনের একমাত্র মহান সৎলক্ষ্যে পর্য্যবসিত হয়; যথা, উপকার।
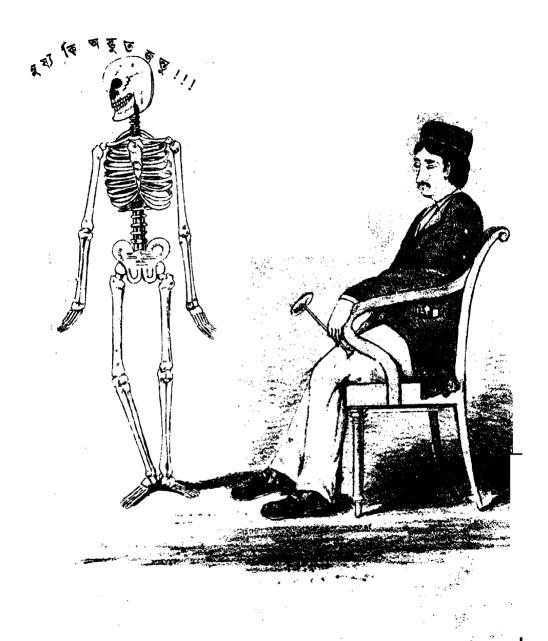
উমেশ। ডাক্তার বাবু? আমি যে অনেক ক্ষণ আসিয়াছি। এই নর কঙ্কালে [illegible] জ্ঞান শূন্য হ
এক দৃষ্টিতে কি দেখিতেছেন? আহা! মানব দেহের এই চরম অবস্থা!!
ডাক্তার। (চমকিয়া) কেও উমেশ বাবু? আপনি চর্ম্ম বস্তা, চর্ম্ম বস্তা কি বলিতেছিলেন? আমি

উমেশ। তবে কি না কি ?

ডাক্তার। গত কল্য কোন স্থানে এক যুবতী আমার নয়ন পথের পথিক হইয়াছে উমেশ, বাবু! আমি মুক্তকণ্ঠে ও সগর্ব্বে মৃত্তিকায় দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারি যে সে রূপ অমানুষী রূপ তুমি কখন গোচর কর নাই।

উমেশ। বটে! তবে নাকি আপনি চর্ম্ম বস্তার ভাবনা ভাবেন নাই ?

ক্রমে ক্রমে।

একদা একাউণ্টাণ্ট জেনারালের আফিশের একজন বাবুর ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। বাবুর নাম রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এক ঘণ্টা হইল কেল্লার সেই গোলকটী শূন্য মার্গে সমুত্থিত হইয়া নিপতিত হইয়াছে। রমেশ বাবু ও তাঁহার বিভাগের ৩০ জন কেরাণী নিম্ন তলস্থ জল খাবার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন রমেশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রমেশ তোমার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, আমাদিগকে এক দিন খাওইতে হইবে।" রমেশ বাবু বলিলেন "মহাশ আমার অবস্থা অতীব শোচনীয়, এ যাব কাল এই দুই কুড়ী টাকা বেতন পাইয় আসিতেছি; আপনকার দিগের আশী র্ব্বাদে আড়াই কুড়ী হইল; কিন্তু অনেব গুলী কাচ্চা বাচ্চা লইয়া সংসার যাত্র নির্ব্বাহ করিতে হয়। অধিকন্তু আজ প্রা দুই মাস হইল ব্রাহ্মণী শয্যাগত, সুতরাং মহাশয়দিগকে একেবারে খাওয়াইতে পারিব না; যদি অনুগ্রহ করেন তবে সকলকে ক্রমে ক্রমে খাওয়াইতে পারি।" এই কথা শুনিবা মাত্র সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে রমেশ বাবু আপন বিভাগস্থ সেই ৩০ জন ভদ্র সন্তানদিগকে, এক দিন রবিবারে নিমন্ত্রণ করিলেন। আহুত ভদ্রেরা বেলা ১০ টার সময়ে রমেশ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। রমেশবাবু সাতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৈঠকখানায় তাস পাশা ও দাবা খেলার মহান আড়ম্বর হইল। বেলা একটা বাজিল, রমেশ

বাবু সকলকে সম্বোধন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন " মহাশয় গণ্ গাত্রোত্থান করুণ, অদ্যকার যাহা কিছু প্রস্তুত হইয়াছে " এই কথা শুনিবা মাত্র সকলে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন তথাকার এক বারাণ্ডাতে ত্রিশ খানা আসন, ত্রিশ খানি কাঞ্চন নগরী থাল, ত্রিশটী জল পুর্ণ গেলাস ও ত্রিশ টুকরা কদলী পত্রে লবন শ্রেণী বদ্ধ সাজান রহিয়াছে। সকলে এক এক খানি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রমেশ গল্প আরম্ভ করিলেন অনেক ক্ষণ পরে অন্য কোন আহায্য দ্রব্য না আসাতে এক জন ভদ্র লোক বলিলেন "রমেশ, বেলা অধিক হইয়াছে যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছ, আনয়ন কর জঠরানল বড়ই জ্বলিতেছে " শুনিবা মাত্র রমেশ বাবু গললগ্নী কৃত বাসে কহিলেন " মহাশয় গণ! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি একেবারে খাওয়াইতে পারিব না, যদি অনুগ্রহ করেন ক্রমে ক্রমে খাওয়াইব। অদ্য এই পর্য্যন্ত আগামী রবিবারে আর যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, মহাশয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব "

চন্দননগর পশুশালা।

(মান্যবর ষ্টেটসম্যান সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত।)

এই পশুশালার জন্য বহু দিবস পূর্ব্বে এলফ্রেড কুরজন নামক সাহেব এক খণ্ড ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। ইতি পুর্ব্বে কতকগুলি পশু ইহাতে স্থাপিত হয় এক্ষণে সমুদায় পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রণালিতে নূতন নিয়মানুসারে উহা সুসজ্জিত হইয়াছে ইহার উপর ফরাসী পতাকা উড্ডীয়মান। কতকগুলি নূতন জীব এখানে আনীত হইয়াছে। সকলে আসিয়া দেখুন। যাহারা অবসরাভাবে এ স্থানে আসিতে অসমর্থ হইবেন তাহারা ভারতবর্ষীয় দর্পণে ইহার প্রতিমূর্ত্তি এই সময় শেষ দেখিতে পাইবেন।
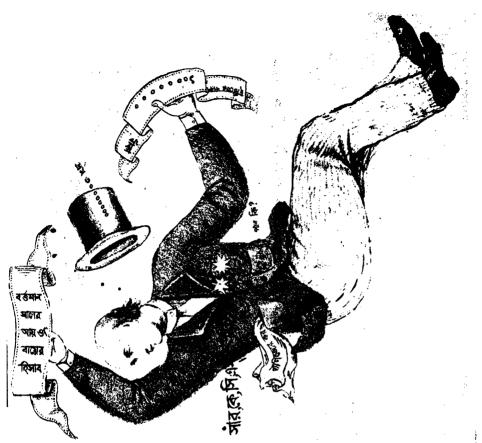
াসেম। হ্যাগা মামু ? নাজ্জির ট্যাকা গুনো কোথায় যায়। আৎ দিন, আৎ দিন, টাক্স, ট্যাক্ সকরে যে- ঝালাতন কল্লে।

মামু। আরে এডা সাম্ ঝাতে পাল্লি নে। ট্যাকা গুনো বে হিসাব খরচা হয়।
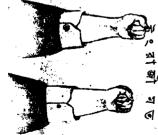
হাসেম। আচ্চা মামু! এই মুলুকের ট্যাকা কড়ি হিসেব দাখিলারকি কেউ একডা নোক নাই?

মামু। আছে বই কি, জানিট্যাচী।

হাসেম। আঃ তেনার তো বড্ডি

হিসেব জ্ঞ্যান্! আর কি রিং্ রেজদের নাজ্জিতে নোক নাই?

ামু। সেই ঝন্নি তো এবার তেনার চাক্ রী ঝাচ্ছে।

াসেম। তা বলে তো মামু। মই পীরের দরগায় শিন্নি চড়াব।

পঞ্চানন্দ
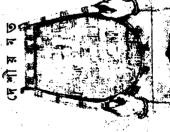
প্রথম কাণ্ড] সন ১২৮৭ সাল [১১শ খণ্ড।

দশ অবতার।

হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তারা ইতিহাস, দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কথা রূপক অলঙ্কারে সাজাইয়াই বলিয়া গিয়াছেন, সাদা সিধা কথায় প্রায় কিছুই বলেন নাই। মানব সমাজের উন্নতির ক্রম দেখাইবার জন্য দশ অবতারের যে কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এ টুকু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দশ অবতার বলিলে সেই একই পদার্থ চির কাল বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। শাস্ত্রকর্ত্তারা যুগে যুগে যেমন অবতার কল্পনা করিয়াছেন, পঞ্চানন্দ এই এক যুগেই সেই সমুদয় অবতার দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্তু এক বঙ্গদেশেই সমস্ত বিরাজমান, সুতরাং বঙ্গের এমন সৌভাগ্যের পরিচয় দেওয়াও পঞ্চানন্দের কর্ত্তব্য।

১। সত্য যুগের অবতার।

এখন সত্য ত্রেতা দ্বাপর নহে মনে করিয়া, যাঁহারা বঙ্গদেশে সত্যযুগের অবতার থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক যেখানে ন্যায় রক্ষা, অন্যায়ের শাসন হইতেছে; যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপের লেশ মাত্র নাই; যেখানে ষোলো আনা পুণ্য—সেই রাজদ্বারেই সত্যযুগ।

সত্যযুগে চারি অবতার—,মৎস্য,

কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ। রাজ-দ্বারেও এই চারি অবতার আছেন।

প্রথম মৎস্য ;—ইনি বঙ্গদেশের পুলিশ ; গভীর জলে বাস, ক্রীড়াচ্ছলে যখন পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া নর সমাজে ভাসিয়া ওঠেন, তখন দৃষ্টি-গোচর ; কোথাও চার পড়িলে ঝাঁকে ঝাঁকে উপস্থিত হইয়া ঘাট তোলপাড় করেন ; আমিষের দোষে নিয়তই অপবিত্র, অথচ নহিলেও চলে না। কদাচ কখনও জালে পড়িলে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। দুই এক জন নিষ্কর্ম্মা লোক কখনও কখনও ছিপ বঁড়শিতে ধরিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে প্রায়ই ফল দর্শে না, লাভের মধ্যে চিনচিনে রোদে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যায়, ও কখনও কখনও কাদা মাখা সার হয়। মৎস্যের আদর তৈলে, পুলিশেরও তাই।

দ্বিতীয়, কূর্ম্ম ;— আদালতের আমলা ; পিঠ বিলক্ষণ মজবুৎ, কৈফি-য়তের কামাই নাই, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে অদ্বিতীয়, গালাগালি না দেয় এমন লোক দেখা যায় না, অথচ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। হাত পা মুখ আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ ঘুশ্ ঘাস পার্ব্বনির বেলায় হাত পা ছেড়ে নখর পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকেন, আর কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিতে পারিলে, মেঘ গর্জ্জন না হইলে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। দেবতার ডাক মানুষের আয়ত্ত নয়, সেই জন্য প্রায়ই রক্ত মাংসের অংশ দিয়া ঘরে যাইতে হয়।

তৃতীয়, বরাহ ;—খোদ মেজে-ষ্টর ; যে দিকে গতি, সেই দিকেই মহাভীতির সঞ্চার, দংষ্ট্রা-ভয়ে লোক শশব্যস্ত ; ভয়ানক গোঁ, কাহার সাধ্য ফিরায় ; কোপ হইলে ফুলের বাগান চষিয়া তাহাতে সরিষা বুনিবার যোগাড় করিয়া দেন। দূর হইতে নমস্কার করিয়া ইহাঁর পথ ছাড়িয়া দেওয়াই সুবোধের কর্ম্ম।

চতুর্থ, নৃসিংহ ;—জেলার জজ; দেওয়ানী বিচারের কর্ত্তা, কাজেই নর, —শান্ত, বিবেচনাপরায়ণ, হিতাহিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত ; দাওরায় বসিলেই সিংহ, পশু হইলেও পশুর

রাজা, তর্জ্জন গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমি থর থর কম্পবান ; অথচ ক্ষুদ্র শ্বাপদগণের রাজা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভয়যুক্ত ভক্তির পাত্র।

২। ত্রেতাযুগের অবতার।

রাজদ্বারের পরেই বিষয়ী সংসারের কথা বলিতে হয়। যাহার উপলক্ষে রাজদ্বারে গতিবিধি করিতে হয়, এবং শরণ লইতে হয়, সুতরাং যাহাতে পাদ পরিমিত অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে সেই বিষয়ী সংসারেই ত্রেতাযুগ।

ত্রেতা যুগে তিন অবতার,—বামন, পরশুরাম, রাম। বিষয়ী সংসারেও এই তিন অবতার।

প্রথম, বামন ;—বঙ্গদেশে ইনি উকীল নামে পরিচিত ; পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে হাকিম বলা যায়; যিনি উকীল তিনি হাকিম নহেন, অথচ হাকিমের আবশ্যকীয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইঁহার আছে, সেই জন্য ইনি বামন। ছলনা করাই উকীলের ব্যবসায়, সে জন্য ইনি বামন। আর, ভিক্ষার ছলে দেহি দেহি বলিয়া মক্কেলের কাছে উকীল যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন তাহাতে কত বলি রাজাই যে পাতালস্থ হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইনি বামনাবতার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দ্বিতীয়, পরশুরাম;—বঙ্গদেশে জমীদার, অতুল প্রতাপ, সর্ব্বদা কুঠার হস্তে মার মার, কাট কাট, শব্দ করিতেছেন, জননী জন্মভূমির প্রতি দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই, কুঠার প্রহারে তদীয় মস্তকচ্ছেদন করিতেছেন, অথচ ধরাপতির একান্ত অনুগত এবং অকৃত্রিম ভক্ত ; (উপাধির জন্য) ক্ষত্রিয় শোণিতে পিতৃতর্পণ করিতে অসঙ্কুচিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তৃতীয়, রাম ;—ব্রহ্মোত্তরভোগী ; কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে দুই একটী প্রজা স্থাপন করিয়া ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদের নিকট কলাটা মুলাটা লইয়া, তাহাদের মানমর্য্যাদা রক্ষা এবং যত্ন সম্মান

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত জাতিশত্রু জমীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রূপ যুদ্ধ সজ্জা করিয়া থাকে, দেবতা ব্রাহ্মণের — সরকার বাহাদুর ও বড় লোকের— প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অকাতর, আর, পেট ভরিয়া খাইতে পায় বলিয়া ভুজবলবিশিষ্ট।

৩। দ্বাপর যুগের অবতার।

যাহাতে স্বার্থের সহিত দেশের মঙ্গল সমভাবে জড়িত, যাহাতে অজ্ঞতা ও সহায়হীনতা চৈতন্য এবং ক্ষমতার সহিত সমপরিমাণে বিভাজিত, এ কলিকালে সেই অর্থীসমাজেই দ্বাপর যুগ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দ্বাপরে দুই অবতার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধ; অর্থীসমাজেও দুই।

প্রথম, শ্রীকৃষ্ণ;—বাঙ্গালা সংবাদপত্র; চতুর, মন্ত্রণাবিশারদ অথচ স্বয়ং রাজত্ব করেন না, স্বয়ং যুদ্ধ করেন না; যাহার পক্ষাশ্রয় করেন, ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জাজ্বল্যমান; সকল ঘটেই বিরাজ করেন, সকলের কথাতেই থাকেন। ইহাঁর জয় হউক, ইহাঁর গৃহীতমন্ত্রের জয় হউক।

দ্বিতীয়, বুদ্ধ;—বাঙ্গালার প্রজা; সমগ্র ভূমির উত্তরাধিকারী অতএব রাজপুত্র সদৃশ, তথাপি সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক; নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রচারক, অন্নাভাবে মরিয়া গেলেই শান্তি, এই মন্ত্রের শিক্ষক। এখন ইহারা জাগিতেছে, অল্পে অল্পে চৈতন্য লাভ করিতেছে, সুতরাং বুদ্ধ।

৪। কলিযুগের অবতার।

কলিতে পুণ্য যৎসামান্য, কারণ ধর্ম্ম লোপ পাইবে, ধার্ম্মিক কাগজের কোপ হইবে, সমস্তই একাকার হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ থাকিবে না, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, অথচ এক রকমে চলিয়া যাইবে। সে একাকার করিবার কর্ত্তা, অবতারের মধ্যে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবতার— কল্কী অর্থাৎ স্বয়ং পঞ্চানন্দ।

মর্ম্মগ্রাহী শ্রোতা।

পাদরী সাহেব চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতার সূত্রপাতেই প্রশ্ন করিলেন—বলো দেখি, এ দুনিয়াটা কার?

এক জন শ্রোতা বাধা দিয়া বলিল— এক শ বার! উচিত কথা বলিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দুনিয়া—টাকারই বটে!

বিজ্ঞাপন।

১ নং

মহৌষধ। অব্যর্থ মহৌষধ !!

পঞ্চানন্দের এণ্টি-বোকামি-মিকশ্চর।

অর্থাৎ

বোকামি নাশক আরক।

এই ঔষধ সেবন করিলে নিরেট বোকামি, পুরুষানুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়। না সারিলে, কবুল জবাবের পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।

সঙ্গতি বুঝিয়া বারো অথবা চব্বিশ মাত্রা সেবন করিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য। নিয়ম না থাকাই এবং না রাখাই ইহার নিয়ম।

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট্ পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অনুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, সভ্যতার খাতিরে মদ্যপান করিযা থাকেন, নাম-কাওয়াস্তে ময়লা ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, যাঁহারা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিগুলী মরের গপিণ্ডীকরণ করিতেছেন, সেই জন্য মাতৃভাষার ধার ধারেন না,

তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মফস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাক মাসুলের চাপ নাই,
ছোটো বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

২ নং

সাধুতা! সরলতা!! সত্য কথা!!!

আজি কালি বিজ্ঞাপনের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়; বিজ্ঞাপন দিতে হইলেই অর্থ ব্যয় হয়। অতএব বিজ্ঞাপন দিলেই কিছু যে লভ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফাঁকি দিতে ইচ্ছা নাই, সেই জন্য সাধুর ন্যায়, সরল ভাবে, এই সত্য কথার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে, যে আমার বড়মানুষ হইবার অতিশয় ইচ্ছা। যাহার যেমন সঙ্গতি নগদ, নোট, মনি-অর্ডর, ডাকের টিকিট, যাহাতে সুবিধা হয় আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেই আমি অব্যর্থ বড়মানুষ হইতে পারিব। বড়মানুষ না হইতে পারি সমুদয় ফিরিয়া দিব। টাকা পাইবার অগ্রে, এবং টাকা পাইবার পরে আমার কেমন চেহারা হয়, ডাক মাসুল পাঠাইয়া দিলে, তাহার ছবি দেওয়া যাইবে।

রসীদের টিকিট লওয়া যাইবে না। ডাকের টিকিট অথবা নোট পাঠাইলে টাকায় এক আনা বাটা দিতে হইবে।

পঞ্চানন্দ-তলা। } শ্রীঅর্থাকাঙ্ক্ষী এণ্ড কোং।

একটা ভরসার কথা।

মিরর পাঠ করিয়া একটা বিশেষ সুসংবাদ জানিতে পারা যায়। তাহা এই যে, বঙ্গদেশের শুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে, বাল্য বিবাহ এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বিবাহ যখনই হউক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ সে বিবাহ বিবাহই নয়, সম্বন্ধ মাত্র। যখন দেখিবে ঘরকন্না, তখন জানিবে বিবাহ। দৃষ্টান্ত কুচবিহারে।

মুসাবিদা।

[সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় ভারতবর্ষের লোক সকলকে উপদেশ দিয়াছেন যে, বিলাতে যে সকল দরখাস্ত এ দেশ হইতে পাঠান হয়, তাহার মজমুন বড় হওয়াতে পার্লিমেণ্টের সভ্যেরা তাহা পড়িয়া উঠিতে পারেন না, সেই জন্য সে সকল দরখাস্তে ফল দর্শে না। ঘোষ মহাশয় বলেন যে দরখাস্ত তিন কথায় সারিয়া দস্তখতে ছয়লাব করিয়া দেওয়াই উচিত।

উক্ত প্রকার দরখাস্ত লিখিবার বিদ্যা অনেকের নাই; সেই জন্য পঞ্চানন্দ এক চুম্বুক দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়াছেন, তাহাতে তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং পঁচিশ কোটি নরের স্বাক্ষর হইলেই বিলাত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে। নিম্নে অবিকল দরখাস্ত দেওয়া যাইতেছে।]

পারিলে-মন্দে সমবেত ইতর-
ঘরের মান্য সভ্যগণের প্রতি।

নিম্নে স্বাক্ষরিত এবং ঢ্যারা-সহি-যুক্ত কাণা দেবতা এবং কালা আদমিদের দীন হীন দরখাস্ত প্রদর্শন করিতেছে

১। যে, দরখাস্তকারিগণ সুখে থাকিতে তাহাদিগকে ভূতে কিল মারে।

২। যে, দরখাস্তকারিদের যে কিছু দুঃখ, তাহা অন্নবস্ত্রের।

৩। যে, দরখাস্তকারিদের সকল গ্রহই বিগুণ।

প্রার্থনা যে গ্রহশান্তি ও ভূতাপসারণের ব্যবস্থা হয়। ইতি, বাহাত্তুরে চৈত্র, ঊনপঞ্চাশ সাল।

(দস্তখত)

খোদ পঞ্চানন্দ এবং অবশিষ্ট বাজে লোক।

বিদ্যা অমূল্য ধন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবদীয় উপাধি হস্তগত করিয়া আসিয়া এক বৎসর ধরিয়া ভরসারাম দত্ত ওকালতীর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রজত খণ্ড দূরে থাকুক, একটী তামার পয়সার মুখও দেখিতে পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া, ওকালতী ছাড়িবার সময়, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়া গেলেন—এত দিনে বুঝিলাম যে বিদ্যা অমূল্য ধনই বটে!

একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিচার।

সংবাদপত্র পাঠ করিয়া জানা যায় যে পৃথিবীর প্রত্যেক ৭৪ চুয়াত্তর জন লোকের মধ্যে এক জন মাতাল আছে।

ষ্টাটিষ্টিক্স অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্ব কখনই মিথ্যা হয় না; বৈজ্ঞানিক অন্যান্য সমুদয় কথাতেই ভ্রম থাকিতে পারে, কালক্রমে সেই ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব অব্যর্থ, অকাট্য, অপরিবর্ত্তনীয়। কারণ, ভবিষ্যৎ কালের বিজ্ঞানচর্চ্চা এই সংখ্যাতত্ত্বের উপরেই অবস্থাপিত।

অতএব একবার দেখা যাউক যে, এই চুয়াত্তরের ভিতর একটা করিয়া মাতাল থাকার ফল কি হইতেছে?

বঙ্গদেশে আজি কালি সভা সমিতির বাড়াবাড়ি হইয়াছে; বহুবাহুল্য হইয়াছে বলাই উচিত। মনে করো, একটা সভায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত। তাহা হইলে ইহার মধ্যে প্রায় পৌনে সাত জন লোক মাতাল। কিন্তু সভাস্থলে পূর্ণ অর্থাৎ ঘোর মাতাল থাকে কি না, সে বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানবেত্তা সন্দেহ করিয়া থাকেন। অর্দ্ধমাতাল দুই চারি জন থাকে, এই রূপ অনেকের বিশ্বাস। যে সকল ব্যক্তি উগ্রবক্তা হইয়া ওঠে, হস্তপদভঙ্গী অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অর্দ্ধমাতাল বলিয়া গণ্য করিলে, পাঁচ শত লোকের সভায় অন্ততঃ তিন জন অর্দ্ধ মাতাল এবং এক জন সিকি মাতাল থাকিবেই থাকিবে। অবশিষ্ট মাতলামির গড় করিলে এই দাঁড়ায়, যে বক্রী লোক কেহ ঠোঁটে গন্ধ, কেহ গোলাপী মাতাল, ইত্যাদি, হইয়া পড়েন। ফল কথা, শুদ্ধসত্ত্ব জন প্রাণী সে সভায় থাকে কি না, তৎপক্ষে বিষম সংশয় হওয়াই উচিত।

ষ্ট্রাচি-বিদায় কাব্য।

Sir John Strachey will pass away unwept, unhonoured, and unsung."

Times of India.

পঞ্চানন্দ বলিতেছেন—"This cannot, must not, be." অতএব

ষ্ট্রাচি-বিদায় কাব্য।

[১]

সচিবের মণি,
ধনস্থানে শনি
ভারতের তুমি ছিলে হে।
পুড়িয়ে ভারতে,
পরতে পরতে
খুব বলিহারি নিলে হে।

শুভঙ্কর-অরি,
আঁকে কারিগরি,
দেখাইলে গুণধাম হে।
ভালো শিখেছিলে,
পরখ দেখালে,
অবতার ঢেঁকিরাম হে।

[২]

আধ নটবর,
আধ ভোলা হর,
লিটন যখন ছিলেন লাট।
লীলা খেলা যত
ছিল মনোমত,
করে' নিয়েছিলে, ভূতের হাট।

দেশে হাহাকার,
লোক শবাকার,
ভারত শ্মশানে হানিয়ে বাজ,
হেথা দলাদলি
হোথা ঢলাঢলি,
নাগরালি ছিল রাজার কাজ।

তুমি ধরে' হাল্
ডিঙী বানচাল,
ভারতের ধন ভাসিয়ে দিসে।
করে' লাইসেন,
শুধু নুন ফেণ,
কাঙালের তা'ও কাড়িয়ে নিলে।

ভুলিয়ে ধরম,
ভুলিয়ে শরম,
মরম যাতনা করিলে শেষ।
কাঙালের ছাই,
তা'ও শেষে নাই,
লোটালে, লুটিতে পরের দেশ।

মিছে কারসাজি,
মিছে ভোজবাজি,
ধরা পড়ে শুধু হ'লে বেহাল।
পরে ফাঁকি দিলে,
ফাঁকিতে পড়িলে,
নারিলে আখেরে ধরিতে তাল।

[৩]

কুবুদ্ধি ব্যতীত ছিল না সম্বল,
কুকীর্ত্তি দেখালে, সে বুদ্ধির ফল;

আরে অকূলাম,
সে সময়ে মান
বিলাতি তাঁতির, করিলে ;
—পরের ধনেতে পোদ্দারগিরি—
ভারতের দফা সারিলে।
"আনাড়ির পাশা, পড়ে খাসা দান,"
—প্রবাদের গুণে, রাজপদে মান
লভিয়া প্রচুর,
লাট বাহাদুর
একটিন্, শেষে হইলে ;
আলীগড়ে গিয়া বিজয়া বিদায়—
তাহাও যাচিয়া লইলে।

[৪]

জ্বালাতন চুকুড়ি বছর,
গ্রহ ছাড়ে এত দিন পর।
যার যার শুর্ জন্ ষ্ট্রাচি,
আয় ভাই বাহু তুলে নাচি।
ঝড় তোল্ কুলা বাজাইয়া,
যা'ক তরী তীর ছাড়াইয়া।
শুভ দিন এত দিনে এল,
ভারতের মহাপাপ গেল।

[৫]

কি ধ্বজা তুলিয়া মন্ত্রি, স্বদেশে চলিলে !
এ দেশেও চূণ কালি মহার্ঘ করিলে !
চিরজীবী হও তুমি, করি আশীর্ব্বাদ ;
তোমার অযশ হোক চলিত প্রবাদ।
যখন চাহিবে লোক তোমা মুখ পানে,
জীবন্ত দেখিবে সবে কলঙ্ক নিশানে।

দেশহিতৈষিতার তহবিল।

(প্রাপ্ত পত্র।)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুর
শ্রীপদপল্লবাশ্রয়েষু।

দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চৈতৎ

আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, আপনার শ্রীচরণে শরণ লইতেছি, উচিত আদেশ করিয়া এ দাসকে এ মহাশঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হয়। আমি একজন পল্লী-গ্রামবাসী ক্ষুদ্র জমীদার। আগে আগে খাইয়া পরিয়া দুদশ টাকা আমার উদ্বৃত্ত হইত, সেই জন্য সামান্য সামান্য লোককে কর্জ্জটা আসটা কখনও কখনও দেওয়া হইত। সরকার বাহাদুরকে যথ-সময়ে রাজস্ব দিই, আলি পথে পাল্কী যোগে এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম যাই বলিয়া পথকর দিই, কি জন্য বলিতে পারিনা, কিন্তু আরও একটা কর দিই, লাইসেন দিই, বেয়ারিং চিঠির মাশুল আর নগদ টিকিটের দাম ছাড়া ডাকফণ্ড দিই,

আর সরকার হইতে যখন যে কাগজপত্র-তলব হয়, তাহাও দিই। এই সকল বিষয়ে আমি কখনও ত্রুটি গাফিলি কিম্বা আপত্তি করি নাই।

বিষয়রক্ষা করিতে হইলে কালে ভদ্রে মামলাটা মোকদ্দমাটা করিতে হয়। যে মোকদ্দমায় আমার পরাজয় হয়, তাহাতে ঘর হইতে কিছু যাইবারই কথা, কিন্তু যে মোকদ্দমায় জয়লাভ করি, তাহাতেও আসল গণ্ডা কখনই পোষাইল না; উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, আমলা সকলেই যথাশাস্ত্র আপন আপন অংশ লইতে লইতে আমার ভাগ্যে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

সরকার বাহাদুরের খাজানা যথা সময়ে দাখিল করিতে পাই বলিয়া, সে অনুগ্রহের দক্ষিণা দিয়া থাকি; পুলিশের এলাকায় বাস করি বলিয়া নিত্য পূজার উপর সময়ে সময়ে মানসিক দিয়া থাকি।

হাকিমহুকুম সাহেব সুবা গের্দ্দিয়ারিতে এঅঞ্চলে আসিলে খাসীটা মুর্গীটা, শাকটা ফলটা ভক্তিপূর্ব্বক যোগাইয়া থাকি। হুজুরী কোনও সর্দ্দার লোকের প্রয়োজন হইলে ধার করিয়া হাতী ঘোড়া পর্য্যন্ত সরবরাহ করি।

আমার সৌভাগ্য বলেই যে এ সকল করিতে পাই, তাহা আমি জানি, এবং শতসহস্র বার স্বীকার করি। স্পষ্ট দেখিতে পাই যে খোদ জজ মেজেষ্টর পর্য্যন্ত দায়ে অদায়ে আমাকে স্মরণ করিয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আমার ন্যায় দীনহীন অকিঞ্চনকে স্মরণ করেন, সেই জন্য হাঁসপাতালের টেক্স, ইস্কুলের টেক্স, অলিঙ্গ কলিঙ্গের কাঙ্গালী বিদায়ের টেক্স, ভোজ সমারোহের টেক্স—যখন যাহা তলব হয়, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর গহনা পত্র বাঁধা দিয়াও হুকুম তামিল করিয়া থাকি। অধিক কি বলিব, এই খয়েরখাঁহীতে আমার ঘরে কিঞ্চিৎ দেনা

প্রবেশ করিয়াছে; তথাপি দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য কমশম করিয়া দিয়া এক প্রকার চালাইয়া আসিতেছিলাম।

এখন উপস্থিত বিপদ এই যে অদ্য এক ইংরেজী পরোয়ানা হুজুর লোক হইতে স্বাগত হইয়াছে, গ্রামের মাষ্টের মহাশয় তাহা পড়িয়া বলিতেছেন, যে দেশ-হিতৈষিতার তহবিলে টাকা জমা দিবার হুকুম আমার প্রতি হইয়াছে। মাষ্টের মহাশয় বলিতেছেন যে এই বার আমি হুজুর হইতে বাহাদুরি পাইলেও পাইতে পারি।

এখন উপায় কি? দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে তাহা আমার কোনও কর্ম্মচারী কিম্বা গ্রামবাসী লোক, কিম্বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে কোনও লোক আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে লড়াই করিতে মানুষ কাটা পড়িয়াছে, সেই জন্য টাকা দিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মারামারি করিতে গেলেই খুন জখম হইয়া থাকে, সে জন্য আমাকে কেন টাকা দিতে হইবে? সুতরাং এ কথাটা নিতান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই যে দেশহিতৈষিতার যদি একটা তহবিল থাকে, তবে আমাকে সে তহবিলে জমা দিতে হইবে কেন? যাহার তহবিল, সে বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার জমাখরচ নিকাশ নিষ্পত্তি করিবে; আমি তাহাতে জমা দিতে যাইব কেন? আর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, আমার মোটে টাকা নাই, তাহার জমা দিব কি? ধার করিয়া জমা দেওয়াতেও ক্ষতি বৈ লাভ নাই। সুতরাং সরকার বাহাদুরের এমন অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সেই জন্য মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা যে ইহার আসল ব্যাওরাটা আমাকে জানাইবেন, আমি শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া থাকিব।

মাষ্টের মহাশয় যে বাহাদুরির কথা বলেন, তাহারই বা ভাবখানা কি? ঘরে না থাকিলেও দিতে পারাতে বাহাদুরি হইতে পারে, কিন্তু সে বাহাদুরি লইয়া কাজ কি? সরকার বাহাদুর এমন বাহাদুরি দিবেন কেন? তবে যদি হুকুম এই রূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আপনি তাহাও জানাইলে আমার পরম উপকার হয়। তাহা হইলে নাকি, গাই না থাকিলেও বলদ দুইয়া দুধ দেওয়া এবং বাহাদুরি লওয়া আবশ্যক।

আমি ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছি না। যদি টাকা জমা দিতেই হয়, তবে ফেরত পাওয়া যাইবে কি না, এবং কত দিনে কি নিয়মে ফেরত পাওয়া যাইবে তাহা জানিতে ইচ্ছা। ফেরত পাওয়া যদি না যায়, তাহা হইলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দেওয়া চলে কি না, অথবা বেবাক টাকার তমঃস্সুক লিখিয়া দিলে সদ্য নিস্তার পাওয়া যাইবেক কি না, তাহাও জানিতে চাহি।

আপনি নাকি সদর জায়গায় থাকেন, আর সকল মুলুকের আসল খবর রাখেন, এই রূপ শুনা আছে, সেই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক

শ্রীএককড়ি রায় দাসস্য।

পুঃ নিবেদন,

এই সকল কথার উত্তর পাইলে, আপনি যদি আমার জেলার মোক্তারিপদ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সালিয়ানা আড়াই টাকা বেতনে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি, ইতি।

[পাঁচ টাকা হউক ভালো, না হউক ভালো, পঞ্চা-নন্দ এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতে অসমর্থ। যে স্থলে, "দিলে প্রাণ যায়, না দিলে মান যায়" সে স্থলে বোধ হয় কেহই কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না।

বিশেষতঃ, রাজা প্রজার কথা, পঞ্চানন্দ ইহাতে একেবারে নীরব। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার কারণ বোঝা যাইবে।

প্রজার "আশা" বলিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়; আবার রাজা রাজড়ার সেই "আশা" বলিলেই "সোঁটা" মনে পড়িয়া রক্ত শুখাইয়া যায়। যাঁহারা রাজাপ্রজার অভিধান উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারাই রায়জীর সমস্যা পূরণ করিবেন।

পঞ্চানন্দ।]

পদবৃদ্ধি।

সদরালার আদালতে মোকদ্দমা হারিয়া আসিয়া হাকিমকে নির্ব্বোধ ইত্যাদি বলিয়া অর্থী গালি দিতে লাগিল।

তাহার উকীল বুঝাইয়া দিলেন—সদরালা ত বোকা হবেই! চতুষ্পদ কি না?

আর আর উকীলেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—চতুষ্পদ কেমন?

তিনি বলিলেন—এটা আর বুঝ্‌লে না?—ভগবান্ দত্ত দুই পদ। মুনসেফীতে প্রথম পদ বৃদ্ধি, কাজে কাজেই সদরালা হইলে পূর্ণ চতুষ্পদ!

পরকালের উপদেশ।

(পাদ্রি পঞ্চানন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।)

ভ্রান্ত নর! আর কত কাল এ মোহ জালে আচ্ছন্ন হইয়া, ইহকালের ইন্দ্রজালে বঞ্চিত হইয়া রহিবে? একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করো, একবার ভাবিয়া দেখো এ প্রকাণ্ড প্রশস্ত সংসারে তোমার কেহই নাই, তোমার কিছুই নাই। "আমার, আমার" বলিয়া যাহা লইয়া তুমি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, বাস্তবিক তাহা তোমার নহে।

ঐ যে দিব্য বস্ত্রে তোমার কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার নহে,—ম্যাঞ্চেষ্টরের। উহাতে তোমার শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। এখনই যদি ম্যাঞ্চেষ্টরের কোপ হয় কিম্বা বিরক্তি জন্মে, এখনই যদি ম্যাঞ্চেষ্টর তোমাকে বলে—আর দিব না,—তাহা হইলে তোমার

গতি কি হইবে? এমন ক্ষণিক প্রেমে আর মুগ্ধ হইয়া থাকিয়াও না। অবিনশ্বর আচ্ছাদনের উপায় করো।

তুমি কাচের দোয়াতে বিলাতি কালি রাখিয়া লৌহের লেখনীতে বিদেশজাত কাগজে লিখিয়া কর-কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত করিতেছ; তুমি বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সম্পাদনের প্রলোভনে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছ,জাহাজে পেষ্ট্‌ বোর্ড আমদানি করাইয়া তদ্দ্বারা তোমার গ্রন্থের আবরণ দৃঢ় করিবার ভাণ করিতেছ, কলের সুচে কলের সুতা পরাইয়া পত্রের পর পত্র যোজনা করিতেছ—সত্য; কিন্তু ভ্রমান্ধ নর! এ সমুদায়ই ফক্কিকার! ইহার মধ্যে তোমার কিছুই নহে মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখো,—সকলই অন্ধকার দেখিবে। ও কি করিতেছ? দেশলাই জ্বালিলে কি হইবে? ও আলোকে এ অন্ধকার দুরীভূত হইবার নহে। তাহার পর, তুমি যে দেশলাই জ্বালিতেছ, তাহাও যে তোমার নহে। অজ্ঞান! এ কথা এখনও বুঝিতে পারিলে না!

পাপের কুহক অতি ভয়ঙ্কর কুহক! এ ছলনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যত্নশীল হও। যে জুতা প্রকৃত পক্ষে তোমার মস্তকের উপর রহিয়াছে, ইহকালের আশু সুখে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, সেই জুতাকে তোমার চরণাভরণ বা চরণ রক্ষণের পদার্থ মনে করিতেছ। এ জুতা তোমার নহে। কারণ তাহা তোমার সঙ্গের সঙ্গী নহে।

প্রাঙ্গনে, গৃহমধ্যে,ঝাড় লাণ্ঠান জ্বালিয়া, বিচিত্র চিত্র শোভিত গৃহ ভিত্তিতে দৃষ্টিপাত করিয়া, ফেটন-যানে বিচরণ করিয়া, তাড়িত তারে মুহুর্মুহু তোমার আত্মীয় স্বজনের কুশল বার্ত্তা আনাইয়া, তুমি স্বীয় ধন গৌরবে মত্ত হই-

তেছ, তোমার ঐশ্বর্য্য মনে করিয়া সুখানুভব করিতেছ, পরকালের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিতেছ। কিন্তু বৃথা এই ঐশ্বর্য্য, মিথ্যা এ গৌরব। মুগ্ধ! যে লৌহ সিন্দুকে তোমার কোম্পানীর কাগজ, তোমার নোট, তোমার টাকা রহিয়াছে—তাহাও তোমার নহে। মায়াপাশ ছিন্ন করো, একবার পরকালের দিকে দৃষ্টিপাত করো।

তোমার আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া অহঙ্কৃত হইতেছ। নির্ব্বোধ! তোমার আবার আয় কোথায়? এ কেরাণিগিরিতে তোমার যেমন অধিকার নাই, এ জমিদারিও সেই রূপ তোমার নহে। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন যদি এইমাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমি নিঃসহায়, নিরুপায়, নিরঃবলম্ব, নিসম্বল। অহরহ, ক্ষণে ক্ষণে মনে রাখিবে—যিনি দিতে পারেন, যিনি দিয়াছেন, যিনি দিতেছেন,—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা মাত্রেই কাড়িয়া লইতে পারেন, অথবা অশেষ প্রকারে তুমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারো।

নাস্তিক! তোমার এ বিষম ভ্রম পরীহার করো, আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করো, যম দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের বিধান করো। অদ্যকার ক্ষণিক সুখে আপ্লুত থাকিয়া, তুমি টপ্পানবিসী করিয়া, গায়ে ফুঁ দিয়া, নিধুরস্বরে গলাবাজি, বা ভাঁড়ের ভণ্ডামি করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার ভ্রমে তুমিই ভুলিতেছ; তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি তোমার গর্জ্জনে ভীত নহেন, তোমার উপহাসে কাতর নহেন, তোমার ভ্রান্ত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না।

অবোধ! হেলায় সব হারাইতেছ। পরকাল তোমারই হস্তে রহিয়াছে; যাহাতে রক্ষা পাইবে তজ্জন্য চেষ্টিত হও।

সরকার বাহাদুরের ভ্রম।

সেনৃশেষ, আদম-সুমারি বা জন-সংখ্যা লইবার হুকুম হইয়া গিয়াছে। এবং সর্ব্বত্র একই সময়ে ঘর, দুয়ার, নৌকা পর্য্যন্ত দেখিয়া মানুষের সংখ্যা ঠিক করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, একটু সঙ্কীর্ণ ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে অনেক ভদ্রলোক গণনার বাহিরে পড়িবেন। খানা ও বাগান গণিবার উপায় করা হয় নাই, অথচ অনেক ভদ্রলোক রাত্রিতে নর্দ্দমাবাসী হইয়া থাকেন, অথবা ভুলক্রমে বাগানবাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়েন, এ কথা সকলেই জানে।

আর একটা কথার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তাহাতেও ভুল হইবার সম্ভাবনা। গণনার সময়ে প্রসবোন্মুখী রমণী এবং আধখানা জলে, আধখানা ডাঙ্গায় ৺ তীরস্থ খাবি-ভক্ষণ পরায়ণ ব্যক্তি, পূর্ণ এক জন বলিয়া অথবা কম বেশ করিয়া গণিত হইবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া উচিত।

ন্যায়সঙ্গত উত্তর।

প্রশ্ন। "ঘোঁড়া এবং গাধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?"

উত্তর। "গাধা।"

প্রশ্ন। "কেন?"

উত্তর। "গাধা পিটলে, তবে ঘোঁড়া হয়।"

ক্ষেপা খগেশের

টিপনী।

—আমি ক্ষেপা, না তোমরা ক্ষেপা? তোমাদের যদি ফুরসুৎ থাকে, তবেই আমাকে দেখিয়া এক আধবার তোমরা হাসিয়া থাকো। অথচ মাথা মুণ্ড কি যে করিতেছ, কেন যে তোমরা সদা শশব্যস্ত, তার ঠিকানা নাই। আমি সারা দিন-রাত হাসি, তোমাদিগকে দেখিলেও হাসি, না দেখিলেও আপন মনে, মনে মনে হাসি। ক্ষেপা তোমরা, না ক্ষেপা আমি?

—উকীল দেখিলেই "হরি হরি বলো,—হরিবোল," বলিয়া চীৎকার করিতে আমার ইচ্ছা হয়। উকীল হইলেই মানুষের আশা ভরসার, শিক্ষা পরীক্ষার,

কার্য্য বীর্য্যের অবসান হয়। একটি একটি উকীল হয়, আর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গভাষা গলাধরাধরি করিয়া এক এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া থাকে। মরণ নানা প্রকার, তাহার মধ্যে উকীল হওয়া এক প্রকার। পয়সা খরচ করিলে উকীলে কথা কয়, না করিলে কয় না। পয়সা খরচ করিলে কলেও শব্দ বাহির হয়, অার্গিনেও সঙ্গীত হয়।

—বিবাহ আর শ্রাদ্ধ একই রকম জিনিশ। লুচি যোণ্ডা, ধুমধাম, আসা যাওয়া দুইয়েই আছে। আর, শ্রাদ্ধের সময়ে টের পায় না—যার শ্রাদ্ধ, সেই; বিবাহের সময়ে টের পায় না—বর। যে শ্মশানে মড়া যায়, সেখানে প্রেতের অভাব নাই, যে বাসরঘরে বর যায়, সেখানেও প্রেতিনী অর্থাৎ পেত্নীর অভাব নাই। আমি এখন চিন্তা করিতেছি, বিবাহ করি কি মরি। এখন ঝোঁক বিবাহের দিকেই। তা'তে বেঁচে মরা হবে।

—লোকে পড়ে না, কেন না পড়িবার উপযুক্ত বই নাই; লোকে লেখে না, কেন না পড়িবার প্রবৃত্তি কাহারও দেখা যায় না। পৃথিবীতে যত বন্দোবস্ত আছে, তার মধ্যে এইটি আমার মনের মতন।

—চাকরির বড় ভক্ত বলিয়া বাঙ্গালীকে অনেকে অভিসম্পাত করে, ঠাট্টা করে, গালাগালি দেয়; অথচ এটা বোঝে না যে স্বাধীন কাজে অক্ষম বলিয়াই বাঙ্গালী চাকরির জন্য এত লালায়িত। স্বাধীন কাজে যে অক্ষম, তাহার কারণ এই যে সকলেই চাকরির চেষ্টায় ব্যস্ত, সুতরাং কাজ শেখে কে, শেখেই বা কখন্?

—দেবতার কাজ অনুগ্রহ কি নিগ্রহ, তাহা বলিবার যো নাই। বৃষ্টির জলে কাহারও ফুটো ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও দেয়ালের

জন্য কাদা করিবার মজুর খরচ বাঁচিয়া যায়। হিন্দুরা বলে, রাজাও দেবতা।

—ব্যারাম হইলে লোকে যে চিকিৎসা করায়, তাহার কারণ এই যে মৃত্যু আশঙ্কার স্থলে ঋণ পরিশোধ এবং দান ধ্যান করিয়া পরকালের পথটা পরিষ্কার রাখাই সুবোধের কর্ম্ম।

—সে দিন যোগাচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন যে সঙ্গে বিষয় আইসে নাই, সঙ্গে বিষয় যাইবেও না; অতএব বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করাই উচিত। যোগাচার্য্য এক ক্ষেপা, নহিলে এমন কথা বলিতেন না। বিষয় যদি সঙ্গে যাইত, অর্থাৎ আমি মরিলে যদি বিষয়ও মরিত, তবে বিষয়ের জন্য ইচ্ছা করিতাম না। কিন্তু বিষয় যে রাখিয়া যাইব! যাহা যাইবে তাহাই মাটী, যাহা রাখিতে পারিব, তাহাই ত আমার।

—সকলেই বলে সময় যাইতেছে, অতএব নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকা অবৈধ। পাগল আর কি? সময় কি একা যায়? সকলকে সঙ্গে করিয়াই সময় যায়। তুমি যখন নিদ্রিত, তখনও তুমি সময়ের সঙ্গে যাইতেছ। বিশ্বাস না হয়, বরাবর ঘুমাইয়া থাকিয়া দেখ, তুমিও সময় মত মরিবে। যে বলে সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সে মিথ্যা বলে। সময়ের সঙ্গে এত হাত ধরাধরি যে ছাড়াইবার যো নাই।

—মানুষ স্বভাবতঃ বস্ত্রচ্ছদ বিহীন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই মনুষ্যের আদি বাস; ক্রমে সভ্যভব্য হইয়া শীতপ্রধান দেশে গমন করিয়াছে। অতএব যাহারা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহারা জানোয়ার বিশেষ।

—বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নাই, তবে জাহাজে চড়িয়া বিদেশ গেলে জাতি যায় কেন? জাতি নাকি

খুব পুরাতন প্রাচীন সামগ্রী, তাই বোধ হয় সমুদ্রের জলে লোণা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

—সকলেই যদি চিন্তাশীল হয়, আর সকলেই নিজ নিজ চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, সাহিত্য বিজ্ঞান লোপ পায়, পড়া শুনা কেহ করে না, অবশেষে সমস্ত লোকই মূর্খ হয়। নবদ্বীপে মূর্খ, গয়াতে ভূত—থাকাটা দরকার।

—আমি প্রবৃত্তির দাস, না কি প্রবৃত্তি আমার দাস, তাহা আজিও স্থির করিতে পারিলাম না। ছানা-বড়া দেখিলে, খাইতে ইচ্ছা করে, এস্থলে প্রবৃত্তি আমাকে চালিত করিতেছে; আবার সর্ব্বপ্রথম ছানাবড়া যখন খাইতে হই-য়াছিল, তখন প্রবৃত্তিও করিয়া লইতে হইয়াছিল, সেখানে প্রবৃত্তিই আমার দাস। কথাটা খুব শক্ত, কিন্তু তত দরকারি নয়। অথচ এমনি ভাবনা ভাবিয়া পৃথি-বীর অর্দ্ধেক লোক আহার নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া থাকে।

হুঁসিয়ার ছেলে।

শিক্ষক। পাঁচ থেকে দুই নিলে কত থাকে?

ছেলে। (মাথা চুলকাইতে চুলকা-ইতে)—জানি না।

শিক্ষক। আচ্ছা মনে করো তোমাকে পাঁচটা কমলা লেবু দেওয়া গেল—

ছেলে। কখন্ দেবেন?

শিক্ষক। মনে করো দিলাম, তার ভেতর থেকে দুটী লেবু আমাকে ফিরে দাও তা' হ'লে তোমার কটা থাকে?

ছেলে। পাঁচটা ত আমায় দেবেন? তা পাঁচটাই আমার থাক্‌বে।

শিক্ষক। না না, তা কেন? দুটো যে আমায় ফিরে দেবে।

ছেলে। (কাঁদিয়া) না, তা আমি একটাও দোবো না।

পাষণ্ড-নন্দ

প্রথম কাণ্ড] সন ১২৮৭ সাল [১২শ খণ্ড।

বিজাতীয় বর্ণমালায় স্বজাতীয় ভাষা লিখিবার বক্তৃতা।

(Roman-অক্ষর সভার আগামি অধিবেশনে জনৈক মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কর্ত্তৃক যাহা পঠিত হইবে।)

ভদ্রাভদ্রগণ অর্থাৎ লেডী z এবং জেণ্টলমEন্,

বেদ বিধির উল্লংঘন করিতে পারা যায়, লোকাচার এবং দেশাচারের শীর্ষদেশে উপানৎ প্রহার করিতে পারা যায়, আত্মাকে নরকস্থ করিতে পারা যায়, কিন্তু সাহেবের অনুরোধে অবহেলা করিতে পারা যায় না, সাহেব-ঘেঁসা বাঙ্গালীকে অসন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না, তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আপনারা সকলেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ; সৌভাগ্য বলে আমার পিতৃভোগ্য অপক্ক-কদলী-সিদ্ধ-সহায়-অন্ন-রাশিকে পরিবর্জ্জন করিয়া, এখন যে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া কণ্টক কর্ত্তরীর সাহায্যে পাদুকা সমেত, ভগবত্যংশ স্বচ্ছন্দে উদরাগত করিবার যোগ্য হইয়া আর্য্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপে সম্যক্ সম্মান

লাভ করিতেছি, তাহা আমি জানি এবং সে সৌভাগ্যের বিধাতা কে তাহাও আমি জানি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাদের অবিদিত নাই।

তবে জিজ্ঞাসা করি, সাহস সহকারে অকুতোভয়ে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্বজাতীয় ভাষায় বিজাতীয় বর্ণমালার প্রয়োগ হইলে যদি পৌরজনরঞ্জন হয়, তবে তদ্রূপ প্রয়োগ বিধানে আমরা কেন নিরস্ত থাকিব? আমরা কি জন্য যত্নপর হইব না? আমাদের উদ্যম সফল হইবে না, আমরা উপহাসাস্পাদ বা নিন্দাভাজন হইব, সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। সংসঙ্গই কাশীবাস—ব্যাস কাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া সংসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাপাতকে পতিত হইব কেন?

ভদ্রগণ, যেখানে উদ্দেশ্য সাধু, সেখানে তৎপোষক যুক্তির অভাব হয় না। স্বজাতীয় অক্ষর বর্জনের সংকল্প যে অতি মহান্, তৎপক্ষে সংশয়ের স্থল নাই। প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক্ বর্ণমালা থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসীগণের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রযুক্তই যে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহাদির প্রশ্রয় হইয়াছে, তাহা কে না বলিবেন? তুমি যবন, তোমাকে কন্যাদান করিব না, তোমার সহিত ভোজ্যান্নতা করিব না—এ কথা বলিলে যে দোষ,—তোমার ভাষা স্বতন্ত্র, অতএব তোমার ভাষাকে আমার অক্ষর দিব না; অথবা আমার ভাষায় তোমার অক্ষর লইব না—ইহা বলিলে যে তদপেক্ষা গুরুতর দোষ হইতেছে, তাহা কি চক্ষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে?

"জাতিবাৎসল্য" শব্দ অভিধান হইতে, ভাষা হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া

দেওয়াই উচিত। তুমি যদি জাতি-বৎসল হও, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যের শত্রু, পরম শত্রু। কারণ, তোমার হৃদয়ে পার্থক্যরূপ মোহাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, আর পার্থক্যই সমস্ত অনিষ্টের মূল। ভ্রান্তি পরীহার করো, প্রশস্ততা অভ্যাস করো, বদান্যতা শিক্ষা করো,—তবে তুমি নিজের উপকার করিতে পারিবে, সংসারের মঙ্গল করিতে পারিবে। যদি সাধুতা থাকে, তাহা হইলে জাতীয় পার্থক্যের বিনাশ করো, ভাষার পার্থক্যের লোপ করো, এবং যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়াও নিজ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করো। অক্ষরই লিখিত ভাষার প্রাণ, সাহিত্যের অস্থি মাংস—সেই মূলে কুঠারাঘাত করো।

বিদেশী এই আর্য্য জাতির ভাষা শিখিতে পারে না, সুতরাং যথোচিত সৌহার্দ্দ্য বিদেশীর সহিত জন্মিতে পারে না। কিন্তু শিখিতে যে পারে না, তাহার কারণ কি? শুদ্ধ, বর্ণমালারূপ অন্তরায়ের দোষে। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স, কোল্‌ব্রুক, মোক্ষমূলর্ কাউয়েল্, প্রভৃতি ব্যক্তির নাম যাহারা করে তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। পৃথিবীতে মনুষ্য-সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিয়া কি হরিতালের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে না, অথবা ব্যবহার প্রচলিত করিতে হইবে না? এক ব্যক্তিরও যাহাতে অসুবিধা বা ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহার অপনয়ন করা অবশ্যকর্ত্তব্য; বিকলবুদ্ধি ব্যক্তির নিমিত্তেও যত্ন করা একান্ত উচিত। বর্ণমালা লোপ করিয়া দাও, দেখিতে পাইবে পৃথিবীতে একটীও স্বতন্ত্র ভাষা থাকিবে না। তখন বিকৃতির বিলোপ হইয়া আবার প্রকৃতির জন্ম হইবে।

সাধারণতঃ বর্ণমালার দোষ

সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। একবার দেবনাগর বর্ণমালার পৃথক বিচার করা যাউক।

ভদ্রগণ! দেবনাগর অক্ষরের সবিশেষ দোষকীর্ত্তন করিতে হইলে শীতকালের রজনীও প্রভাত হয়। সে পণ্ডশ্রমে আমি লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। দুই চারিটা মুখ্য দোষের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আদৌ, দেবনাগরের নামেই দোষ। যে সভ্য সমাজে নর-নাগরের লাঞ্ছনা, সে সমাজে ভাষায় নাগর থাকিবে, ইহা অতি অসঙ্গত। তাহার উপর, দেবনাগর কোনও জীবন্ত ভাষাতেই প্রযুজ্য নহে। তবে, বলুন দেখি, দেবনাগর কোন্ লজ্জায় রাখা যাইবে?

আপনারা অবগত আছেন যে অন্ধকে অন্ধ বলিলে, মূর্খকে মূর্খ বলিলে সে দুঃখিত হয়, রাগ করে। সংস্কৃতজ্ঞ অনেক লোক বায়ুগ্রস্ত, তাহাও আপনারা জানেন। যে বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা নিয়তই বায়ুসংখ্যা মনে করাইয়া দেয়, তাহার সংরক্ষণ করিতে গিয়া কোন্ মতিমান সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আত্মক্ষতি সাধন করিতে পারেন? আমার অনুরোধ,—আসুন, আমরা উনপঞ্চাশৎ সভ্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া দুরন্ত বর্ণমালার বিনাশ করিয়া সফলমনোরথ এবং নির্ব্বিঘ্ন হই।

দেবনাগর বর্ণমালাই ভঙ্গভাবাপন্ন হইয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং তাহার দোষোদ্ঘোষণ, বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র। এই উভয় বর্ণমালাই দুর্ব্বল; নিজ ভাষার কার্য্য ব্যতীত অন্য ভাষার লিপিকার্য্যে সক্ষম হইবার শক্তি ইহাদের নাই। দুর্ব্বলের মরণই মঙ্গল, অতএব এ বর্ণমালার যত শীঘ্র বিলোপ হয়, ততই উত্তম।

এখন দেখা যাউক, উপযোগিতা পক্ষে ইংরেজী বর্ণমালা কত

অংশে শ্রেষ্ঠতর। বৈয়াকরণেরা বারংবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইংরেজ জাতীয় মনুষ্যের ন্যায়, ইংরেজী বর্ণমালাও স্বাধীন। কি মনুষ্যের, কি বর্ণের, কোনও কার্য্যই ইহাদের অকরণীয় নহে, অথচ কোনও কার্য্য ইহাদের নির্দ্দিষ্টও নহে। আমাদের যেমন ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হইবে, জুতা বেচিতে পাইবে না, সেই রূপ 'ক' 'ক'ই থাকিবে, 'ছ'র কাজ করিতে পাইবে না। কিন্তু, ইংরেজের শক্তি দেখুন, প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতে যেমন উপযুক্ত, হল চালনাতেও সেই রূপ, বরং ততোধিক উপযুক্ত। ইংরেজী স্বরবর্ণের মধ্যে যাহাকেই লউন, কেহই নিয়মিত কার্য্যের দাস নহে;—এখন যিনি "এ," অন্য সময়ে তিনি "আ," কখনও বা "অ," তখনই আবার "অ্যা"—বাস্তবিক ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। "S" ঘরে নাই, "C" তাহার কাজ করিয়া দিবে; "K" অনুপস্থিত, সেখানেও 'C' কাজ করিতেছে। কি মাহাত্ম্য! কি উদারতা! কি অমিত পরাক্রম! এমন মানুষ নহিলে কি মানুষ। এমন অক্ষর নহিলে কি অক্ষর!

আবার দেখুন। ঐ এ, বী, সী, ডী বর্ণমালা কেবল যে ইংরেজের বা ইংরেজী ভাষার ক্রীত দাস, তাহা নহে। নানা ভাষায়, নানা দেশে ইহাদের প্রসার; আর যেখানে যেমন ইচ্ছা, শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। অধিকন্তু অক্ষর গুলির গাম্ভীর্য্য এবং মর্য্যাদা বোধও প্রচুর;—শব্দের মধ্যে, মূলে, বা অন্তে অক্ষর বিরাজ করিতেছে, অথচ নীরব, নিঃস্পন্দ। এ শক্তি, এ আত্মসংযমনের ক্ষমতা অন্য কোনও বর্ণমালারই নাই। ঐ একই অক্ষর দিয়া ফরাশি লিখিতেছে, ইংরেজের তাহা অনুচ্চার্য্য, ইংরেজ লিখিতেছে, ব্রহ্মাণ্ডের তাহা অনুচ্চার্য্য। বস্তুতঃ, যতই প্রবেশ করিয়া দেখ যায়, ইংরেজী

বর্ণমালার গুণে ততই মোহিত এবং বিস্মিত হইতে হয়।

সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক। স্বরবর্ণই লিপিকার্য্যের আত্মা-স্বরূপ। ইংরেজীতে পঞ্চভূত স্বরূপ পঞ্চ স্বরবর্ণ! অহো! কি আনন্দের বিষয়!

পঞ্চ ভূতে সংসার চালাইতেছে, আমরাও চালাইব। পঞ্চ স্বরবর্ণেই ভাষা চালাইব, তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে, প্রথমতঃ ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন ভাষা জানিতে হইলে অগ্রে ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্বজাতীয় সাহিত্যের জন্য বিজাতীয় বর্ণমালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর দোষ রহিল কোথায়? আর, যদি শাস্ত্র মানিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে পঞ্চ স্বরাত্মক বর্ণমালাকেই যে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চ ভূতেই সকল পদার্থ নির্ম্মিত, অথচ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের পার্থক্য নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা বা ক্লেশ নাই; যে পাঁচ ভূতে উমেশ, সেই পাঁচ ভূতেই রামদাস,—তথাচ রামদাস শুইয়া আছে তাহাতে উমেশের বসিয়া থাকার ব্যাঘাত নাই এবং উমেশকে চিনিয়া লইতেও কষ্ট নাই। যত গুলি পৃথক্ পৃথক্ স্বর-ধ্বনির প্রয়োজন, এই পঞ্চ স্বরেই আঁক্‌ড়ি, বিন্দু, ফুটিক ইত্যাদি দিয়া লইলে তত গুলি পৃথক্ স্বরই পাওয়া যাইবে, অথচ মূলে যে পঞ্চ স্বর সেই পঞ্চ স্বরই রহিয়া যাইবে। এ প্রকার বিচিত্র কৌশল আর কোথায় আছে? তবে কেন দেশীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব? বর্ণের দেশীয় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে, রাখিয়া দাও; কিন্তু দেশীয় মূর্ত্তি কখনই রাখা যাইতে পারে না! কোট্‌পেণ্টু-লন্‌ধারী তেঁতুলে বাগ্দীর সম্ভ্রম

রেলওয়ে ষ্টেশনে যে দেখিয়াছে; ইংরেজী বর্ণমালায় সজ্জিত দাশুরায়ের পাঁচালীর গৌরব সেই বুঝিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা অবগত আছেন, যে, "কলি শেষে এক বর্ণ হইবে যবন।" তবে কি আর বর্ণভেদ রাখা শোভা পায়? আইস ভদ্রগণ, শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া কল্কী অবতারের সহায়তা করি। কৃতকার্য্য হইলে আমরাও ক্ষুদ্র অবতার হইতে কেন না পারিব?

উপসংহারে আর একমাত্র কথা বলিব;—মুখে সকল বাঙ্গালীই পঞ্চশরের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করেন, ব্যবহারেও তাহার অনুগমন করেন; কিন্তু লিখিবার বেলায় এত স্বর বাহুল্য কেন? পূর্ব্বাপর অসংলগ্নতা জন্য বঙ্গবাসীর কি লজ্জিত হওয়া উচিত নহে? গর্দ্দভের একমাত্র স্বর—অথচ সেই এক স্বরেই গর্দ্দভ ইহ জগতে অদ্বিতীয়। আইস, বন্ধুগণ, যত্ন করি, এখন পঞ্চস্বর অবলম্বন করি, ক্রমে আমরাও একস্বরে অদ্বিতীয় হইতে পারিব।

যাহা হউক, বলিয়া কহিয়া দিলেও, শিক্ষাবলে অভ্যাস করিয়াও যাহারা "Ami calilam" দেখিলে "আমি চলিলাম" পাঠ করিতে পারিবে না, তাহারা শিবের অসাধ্য; তাহাদের জন্য আমাদের প্রতিপত্তি, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের দূরদর্শিতা নিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি কখনও প্রকৃত উন্নতি হয়, যদি কখনও বরফ্‌শাম্পেনে শালগ্রামের "শীতল সেবা" হয়, তবে জানিবেন, সে আমাদের কর্ত্তৃকই হইবে।

ন্যায়রত্ন-কীর্ত্তি।

এখন অবধি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতানুসরণ অভ্যাস করা উচিত, সেই জন্য নিম্নে দুইটী সরল পাঠ দেওয়া গেল—

১। "এসো, এসো, ভায়া এসো" লিখিতে হইলে "*s-o, s-o, viâ s-o*" এই রূপ বানান করিতে হইবে।

২। "Gave him legacy" দেখিলে পাঠ করিবে "গোবে (অর্থাৎ গোবিন্দের) হিম লেগেচে।"

দেবতার পক্ষপাত।

যে দরিদ্র, তাহার উপর দেবতারও কোপ দেখা যায়; কিন্তু মহাপাপীও যদি দরিদ্র না হয়, তাহা হইলে দেবতা তাহার অনিষ্ট করেন না। আমার ঘর নাই, মাথা বাঁচাইবার স্থান নাই, আমিই বৃষ্টিতে ভিজিব; আর, তুমি চুরি করা ছাতাটী মাথায় দিয়া চলিয়া যাইতেছ, তোমার মাথায় জল পড়িবে না।

ক্ষেপা খগেশের

টিপনী।

—সব যাইবে, নাম থাকিবে। উত্তম কথা; কিন্তু পৃথিবীই যদি যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কি নাম থাকিবে?

—বিচ্ছেদই স্বাভাবিক; আত্মীয়তা, সদ্ভাব, প্রণয় বা মিলন কেবল ভণ্ডামি অথবা কাজ হাসিল করিবার ফিকির মাত্র। পৃথিবীতে আসিবা মাত্রেই পরমাত্মীয় জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, মরিবার সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ; আর এই দুইটিই স্বভাবসিদ্ধ কাজ। তবে, নাট্যশালার অভিনয় করিবার জন্য যত যাহাই দেখাও। আসলে সব ফাঁকি।

—বিদ্যা শিক্ষা এবং চৌর্য্যক্রিয়াতে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। পরের ধনে স্বার্থসাধন উভয় কর্ম্মেরই অভিপ্রেত। তথাপি যে, লোকে চোরের উপর এত রাগ করে, সেই জন্যই বিদ্বান অপেক্ষা অর্থশালীর সম্মান এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

—উপার্জ্জনের প্রধান উপায় অনিচ্ছা প্রদর্শন; খাইতে বসিয়া

আর লইব না বলিলেই, পরিবেষ্টা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। আহারে মানুষের প্রয়োজন নাই বলিয়া অমরিকায় এক ব্যক্তি দিন কতক উপবাস করিয়াছিল; তাই দেখিয়া লোকে তাহাকে এত অর্থ দিয়াছে, যে এখন তিন পুরুষেও আর তাহার অন্নচিন্তা হইবে না।

—কৃষিজীবীদের ভূমির উপর বড়ই মায়া; যে কৃষিজীবী সে চাষা; চাষা বলিলে গালাগালি হয়, অসভ্য বুঝায়। পাছে কেহ অসভ্য বলে, এই ভয়ে অনেক লোক জন্মভূমির প্রতি মমতা প্রদর্শন করে না।

—যিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, সকলে তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করে। তবে যে এত রিফু করিয়া, ছেঁড়া যুড়িয়াও দর্জীর গৌরব নাই, তাহার হেতু এই যে দর্জী ধনবন্ত নহে, পেটের দায়েই অস্থির। বাস্তবিক যত প্রকার পাপ এবং যত প্রকার অপরাধ আছে, সমুদায়ের চেয়ে পেটের দায় গুরুতর।

—অবিশ্বাস যদি সংসারে এত অধিক এবং এত প্রবল না হইত, তাহা হইলে লেখাপড়ারও এমন আদর হইত না।

—দোকানদার লোক অতিশয় মুর্খ। সে দিন একটু কাপড়ের দরকার হওয়াতে, আমি এক দোকানে গিয়া কাপড় চাহিলাম; দোকানদার আমার নিকট টাকা চাহিল। টাকা আমার নহে, কাহারই নহে, টাকা রাজার; সুতরাং আমি হাতে করিয়া দিলেও আমার টাকা দেওয়া হইবে না, এই কথা দোকানদারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি টাকা দিতে অসম্মত হইলাম, কিন্তু তথাপি তাহার ভ্রম গেল না। এমন মুর্খের সহিত ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমিও আর কাপড় লইলাম না, রাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন রিপুদমনেই মনুষ্যত্ব;

রাগ একটা রিপু। আবার দোকানদারের কাছে যাইব কিনা, ভাবিতেছি।

—অগ্নিকে সর্ব্বভুক বলে, সেটা ভুল। জলে তেলে একত্র দিলে অগ্নি তেলটুকু চুষিয়া খায়, জল পড়িয়া থাকে। অগ্নি সর্ব্বভুক নয়, সারগ্রাহী বটে।

—আপনার সুখ্যাতি আপনি না করিলেই অখ্যাতি হয়। তুমি একটা টাকা আমাকে দিলে, তাহার বদলে আমি তোমাকে সতরো আনা পয়সা দিলাম। যদি চারি পয়সা অতিরিক্ত দানের কথা নিজ মুখে আমি বলিয়া দিই, তবে আমি সদাশয় লোক; যদি সে কথাটা না বলিয়া দিই, তাহা হইলে সকলেই বলিবে আমি বিষয়বুদ্ধিহীন বোকা।

—মনের মত না হইলে সত্য কথাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। দুষ্টেরই শাসন করা বিধি, নির্ব্বোধের শাস্তি হইতে পারে না; কিন্তু চোর যদি বলে যে আমি বোকা নহিলে চুরি করিব কেন, আর চুরি যদি করি তবে ধরা পড়িব কেন? তাহা হইলে, কথাটা যদিও সত্য কিন্তু বিচারকের মনোমত হয় না, সেই জন্য তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া, চোরকে দুষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। ফলে এই হয় যে, যে আসল বোকা সেই দুষ্ট আর যে আসল দুষ্ট সে বোকা প্রতিপন্ন হয়।

—যাহার যাহা নাই, সে তাহাই ভিক্ষা করে। কিন্তু কাণা ত চক্ষু ভিক্ষা করে না। সুতরাং জানা গেল যে, যাহা কিনিতে মেলে না, তাহা ভিক্ষা করিলেও পাওয়া যায় না, সেই জন্য কেহ তাহা ভিক্ষাও করে না। অতএব ভিক্ষা করাই ভুল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া আনাই কর্ত্তব্য।

—বিদ্যাকে অমূল্য ধন বলে কেন? ঘরের পয়সা খরচ আর শরীর মাটী না করিলে বিদ্যালাভ

হয় না। যদি বলো মূল্য দিলেও অনেকে পায় না, তা' এমন অনেক জিনিশই ত পাওয়া যায় না। বাজারে আলুর আমদানি নাই তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আলু অমূল্য ধন?

সংবাদপত্রের ভ্রম।

ভারত-ছাড়া ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী স্যার জন্ ষ্ট্রাচি লাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে কৌন্সিলের সভাপতি হয়েন, কিন্তু সভাপতির কাজ করেন নাই। সেই জন্য সংবাদপত্র সকল ষ্ট্রাচি বাহাদুরের নিন্দাবাদ করিতেছিল।

তাহাদের জানা উচিত যে "দুষ্ট এঁড়ে চেয়ে শূন্য গোহাল ভালো।"

অকাট্য প্রমাণ।

"যাঁহারা উন্নতব্রাহ্ম,তাঁহারা হিন্দু নহেন —ইহা কিসে জানা যায়?"

"তাঁহারা আদরের সহিত রবিবারে দর্পণ দেখেন।"

"তাহাতে কি প্রকারে জানা গেল?"

"হিন্দুদের বিশ্বাস আছে যে রবিবারে দর্পণ দেখিলে কলঙ্ক হয়। কলঙ্কে হিন্দুর সাধ নাই।"

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা।

[ইতিমধ্যে বাখরগঞ্জের জজ কম্পবেল সাহেবের বাসার সরহদ্দে জনেক ব্রাহ্মণ কনষ্টেবল পাইখানাকৃত্য সমাধা করাতে, জজ কম্পবেল উক্ত ব্রাহ্মণের স্বহস্তে তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লন। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট তজ্জন্য জজ সাহেবের শাস্তির জন্য তাঁহাকে অপদস্থ অর্থাৎ জজ হইতে জাণ্ট্ মেজেষ্টর করিয়া দিয়াছেন।

অপর, জঙ্গীপুরের মহকুমাতে গোরু ছিনাইয়া লইবার মোকদ্দমায় ডিপুটী মেজেষ্টর অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর উপযুক্ত সাজা না দেওয়াতে অর্থাৎ আসামীকে কয়েদ না করিয়া জরিমানা করাতে মুর্শিদাবাদের খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব ডিপুটী-মেজেষ্টর বাহাদুরের ভ্রম দেখাইয়া এক খণ্ড হাফ্ সরকারি পত্র তাঁহার বরাবর লেখেন। পুনশ্চ, ক্ষতিগ্রস্ত নীলকর সাহেব পুনর্ব্বার গোরু ছিনাইয়া লওয়ার অপরাধে সাবেক বকেয়া আসামী একাব্বার মণ্ডলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার নালিশ করায় ডিপুটী বাবু নিজ রায়ে খোদ মেজেষ্টরের সেই চিঠির উল্লেখ করিয়া একাব্বার মণ্ডল আসামীকে বিলক্ষণ মেয়াদ ঠুকিয়া দেন। তাদৃশ কঠিন সাজা দিতে

আইন মতে ডিপুটী বাবুর এক্তার না থাকা কথিতে উক্ত এক্তার মণ্ডল জেলার জজ আদালতে আপীল দায়ের করে। খোদ মেজেষ্টর কায়িক দণ্ড দিবার উপদেশ দিয়া যে পত্র লেখেন, তাহা ডিপুটী রায় বাহাদুরের রায়ে প্রকাশ থাকাতে জেলার জজ ঐ খোদ মেজেষ্টর সাহেবকে বলেন যে এ প্রকার পত্র লিখিলে ভবিষ্যতে মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের খারাবি হইতে পারে। খোদ মেজেষ্টর ইহাতে রাগত হইয়া জঙ্গীপুরে শুভাগমন ও ডিপুটী বাবুকে তলব করিয়া স্পষ্টাক্ষরে মুখের উপর বলিয়া দেন, যে তাহার পত্রের কথা রায়ের ভিতর প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে ডিপুটীর বোকামি অথবা সাফ্ বজ্জাতি জানা যাইতেছে। তাহাতে ডিপুটী রায় বাহাদুর অপমান জ্ঞান করিয়া কমিশ্যনর সাহেবের হজুরে মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করাতে কমিশ্যনর সাহেব তজ্জন্য ডিপুটীর বেতন কমাইয়া দিয়া অপদস্থ করণ জন্য বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট সাহেবের সদনে সুপারিশ করেন। ক্ষুদ্র লাট ডিপুটী বাহাদুরকে মহকুমায় থাকিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দিয়াছেন। এবং বজ্জাতি শব্দের অর্থ বজ্জাতি মাত্র তদতিরিক্ত কিছু নহে, এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মেশলি সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে অতুল বাবুকে সেই মর্ম্মে এক পত্র যেন লেখা হয়।]

বাঙ্গালার লাট সাহেবের এই দুই বিচার কার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য পঞ্চা-নন্দ সমীপে পেশ হইয়াছে।

প্রথমতঃ কম্পবেল সাহেবের অধোগতি দর্শনে পঞ্চা-নন্দ দুঃখিত হইয়াছেন। সাহেব হইতেছেন রাজকুল, সে কুলে কালি দেওয়াতে লাট সাহেবেরই অবিবেচনা প্রকাশ পাইতেছে। যে ব্যক্তি আত্মকলঙ্ক গোপন করিতে জানে না, সে লোকের হস্তে লাটগিরি রাখা উচিত কি না পঞ্চা-নন্দ তাহার বিবেচনা পশ্চাৎ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীদের মনে এপ্রকার ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে কনষ্টেবলের দরখাস্তেই বুঝি জজ সাহেবের চাকরি গেল। অথচ এরূপ ধারণা জন্মিয়া গেলে, এবং প্রকৃত পক্ষে কনষ্টেবলের কথায় জজ সাহেব হেন ব্যক্তিকে অপদস্থ হইতে হইলে, ইহার পর রাজকার্য্যে সাহেব লোক পাওয়াই দুঃসাধ্য হইবে। এদিকে সাহেব লোক যদি বিরক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আর চাকরি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বাহুধিকার বৃথা, সমুদ্র লঙ্ঘন বৃথা, আর মিথ্যা-কল্লোতে-দশানন-রূপী বঙ্গবাসীর পুরী ছারখার করাও বৃথা।

সুতরাং হর লাট সাহেব কম্পবেলের

জজিয়তি কম্পবেলকে পুনঃপ্রদান করুন; নতুবা, যদি অভ্যন্তরের কোনও গূঢ় কথা থাকে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দুরাশী বঙ্গবাসীর ভ্রম দূর করুন।

মৌশলির অতুল-কীর্ত্তি সম্বন্ধে লাটের বিচার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও পূর্ব্ববৎ মন্দ হয় নাই। লাট-বুদ্ধির উন্নতি দেখিয়া পঞ্চা-নন্দের আশ্বাস হইয়াছে।

অত্যাচার কাহাকে বলে অতুল বাবু তাহা জানেন না। নচেৎ গোরু ছিনাইয়া লওয়ার মোকদ্দমাতে তাদৃশ অল্প দণ্ড দিতেন না। ইহাতে জানা যায় যে অতুল বাবুর নীলের চাষ নাই।

আইনে সাজার চূড়ান্ত সীমা লিখিয়া দেয়, অপরাধ বুঝিয়া, অপরাধীর সেই দণ্ডের তারতম্য করাই হাকিমের কর্ম্ম। অতুল বাবুর প্রতি দয়া করিয়া কোন্ মোকদ্দমায় কি আন্দাজ সাজা দেওয়া উচিত মৌশলি সাহেব ইহা দেখাইয়া দেওয়াতে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ হাকিম হইয়া যে বুদ্ধিটুকু খাটাইতে হয়, অতুল বাবুর আর তাহা খাটাইতে হইত না, অথচ পুরা মাহিয়ানাটা বাক্সগত হইতে পারিত। এ সামান্য কথা অতুল বাবু বোঝেন নাই, সুতরাং খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব যে তাহাকে স্বয়ং নিজ মুখে বোকা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় নহে। তবে বোকাকে বোকা জানিয়াও যদি বোকা বলিতে না পাইব, তবে কি বলিব? মৌশলি সাহেব যে স্পষ্টবাদী সরলভাষী সত্যপ্রিয় ইহা লাট সাহেব বুঝিতে পারেন নাই।

লাট সাহেব বলিয়াছেন যে বজ্জাত শব্দটা কিছু রূঢ়, সুতরাং মৌশলি সাহেবের এমন শব্দ প্রয়োগ না করাই উচিত ছিল। মৌশলি সাহেব দেখাইয়াছেন যে এই শব্দের চলিত অর্থ তত মন্দ নহে। বঙ্গভাষায় যাহার এ প্রকার গাঢ় জ্ঞান, অবসর বুঝিয়া যিনি শ্লেষ করিতে জানেন, তাহাকে ভাষা জ্ঞানের জন্য পুরস্কার না দিয়া তিরস্কার করা যে কাঁহাতক অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন এক জন সাহেব যে বঙ্গভাষায় গালি দিয়াছেন, ইহাতে ভাষার গৌরব, সাহিত্যের সম্মান, এবং অতুল বাবুর সৌভাগ্য মনে করা উচিত। যে অতুল বাবু বাঙ্গালী হইয়াও এ কথা বুঝেন নাই, তাঁহাকে বাঙ্গলা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দি ভাষী পূর্ণিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দেওয়া সৎপরামর্শের কাজ হইয়াছে।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে লাট সাহেবকে এই পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়াই পঞ্চা-নন্দ অদ্য পুঁথিতে ডোর বাঁধিলেন।

সেন্‌শেষ
বা
লোক-সংখ্যা।

আবার, যে তুলেছে দেশে, সেন্‌শেষের
নিশান।
এতে, ছানা ধাড়ি, কড়ে রাঁড়ী,
কেউ পাবে না পরিত্রাণ।
দেখ্‌তে পাই সবাই ভাবে,
পাছে কবে ভূতে পাবে;
কর্‌বে বা কি ভূতের বাপে,
সেনে কাজের সমাধান।
আবার যে তুলেছে দেশে, সেন্‌শেষের
নিশান।
বল্লাল সেন হয়ে রাজা,
তুলে দিলে কুলের ধ্বজা,
এখন, কূল কিনেরা, যায় না দেখা,
কুলের দায়ে হারাই মান।
আবার যে তুলেছে দেশে সেন্‌শেষের
নিশান।
দেশে আগে ছিল ধর্ম্ম,
কর্‌'ত লোকে ক্রিয়ে কর্ম্ম,
এখন, কেশব সেনের হ্যাপায়
পড়ে,'
হিঁদু য়ানি অক্কা পান।
আবার, যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
তখন ছিল জাত বিচার,
কর্‌ত ব্যভার যেমন যার,
কালে, এক টেবিলে, বামুন যবন,
উইলসেনে খানা খান।
আবার, যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
যারা বেচে মুড়কি মুড়ি,
কর্‌'ত সুখে নুনের কড়ি,
পোড়া লাইসেনে তা'র গলায়
ফাঁসি,
বেঁধে' দিলে হ্যাঁচ্‌কা টান।
আবার, যে তুলেছে দেশে ইত্যাদি।
ছলে বলে কি কৌশলে,
একে একে সকল নিলে,
এখন, স্ত্রী পুরুষে, ভাব্‌চি বসে'
সেন্‌শেষে বা যাবে প্রাণ।
আবার যে তুলেছে, দেশে ইত্যাদি।
কালে কালে, সেনে সেনে,
দেশে দিলে তুলো ধুনে,
ভালো, এত মুলুক বাইরে আছে.
সেনজা কি আর পায় না স্থান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।

চিন্তাকুল
শ্রীবাউল।

[পঞ্চানন্দ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলেন। ভারতবর্ষে এ প্রকার অজ্ঞ লোক থাকা অসম্ভব; কারণ সভার অভাব নাই, এবং বক্তৃতার বিরাম নাই। পঞ্চা-

নন্দের আশঙ্কা এই যে কোনও কল্পনা-কুশল কবি এই অলীকবাদে অপবাদ করিয়া যশোলাভের দুরভিসন্ধি করিয়াছেন।]

আসামীর জবাব।

রাধামাধব মাতাল হইয়া রাস্তায় দৌরাত্ম্য করিতেছিল, এমন সময়ে পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ঝোলায় তুলিয়া লইয়া গেল এবং থানায় সমস্ত রাত্রি কয়েদ করিয়া রাখিয়া দিল।

সকাল বেলা চালান দিবার সময়ে নাম জিজ্ঞাসা করাতে, রাধামাধব মনে করিল যে নাম প্রকাশ হইলে লজ্জার বিষয়, অথচ জরিমানা কিছু হইবেই, সেই জন্য প্রকৃত নাম গোপন করিয়া আপন নাম লেখাইয়া দিল—রামচন্দ্র।

আদালতে উপস্থিত হইলে রাধামাধবের এক জন বন্ধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার ফলে, নাম ভাঁড়াইবার অপরাধে আর এক অভিযোগ তাহার উপর চাপিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার আসল নাম কি ?

"আজ্ঞে, রাধামাধব"।

বিচারক—"তবে পুলিশে নাম ভাঁড়াইয়া প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে কেন ?"

"হজুর, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম, —তখন কাজে কাজেই—রামচন্দ্র।"

বিচারক—"রাস্তার উপর মাতলামি করিতেছিলে কেন ?"

"হজুর, মাতলামি করি নাই। তবে রাত্রি অধিক হয়েছিল, গাড়ী পাল্কী পাওয়া গেল না, হেঁটে বাড়ী যাই এমন সঙ্গতিও ছিল না, তাই কোম্পানীর ঝোলা ডাক্‌ছিলাম।"

বিলাতের
সংবাদদাতার পত্র।

সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ আপনার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ দাসের প্রাণ গতিক মঙ্গল। পরে নিবেদন, আমার অন্তঃকরণে বড় দুঃখ হইয়াছে, যে হেতু এ সংসারে যোগ্য ব্যক্তির মরণ, অযোগ্যের সুখ সমৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে অকাল-কুষ্মাণ্ডের পিতা পিতামহ জমীদারি রাখিয়া গিয়াছে, সে তাকিয়া ঠেসান দিয়া স্বচ্ছন্দে মদের ইয়ার, গুলির গোলামে পরিবেষ্টিত হইয়া দুনি-

য়াকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে; আর আমি না কি আজন্ম খাটিয়া বিদ্বান হইয়াছি, সেই জন্য আপন ভিটায় দু দিন কাটাইতে পাই না। আপনি আমাকে ধরিয়া কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন; সেখানে যেই সুখ্যাতির সহিত কার্য্য আঞ্জাম দিলাম, অমনি আমার মস্তকে বজ্রপাত হইল; আপনি আমাকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তবু এত দিন নানা টাল বাহানায় ফাঁকি দিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম যে আমা ভিন্ন আপনার গতি নাই, আপনার ভক্তগণ চটিয়া যাইতেছে, তখন অগত্যা আসিতে হইল। বলুন দেখি, ইহাতে দুঃখ হয় কি না হয়?

জাহাজে আরোহণ করিয়া আমার আরও কষ্ট হইয়াছিল। প্রথমতঃ সামুদ্রিক বীচি দর্শনেই ত অন্তরাত্মার চৈতন্য লাভ হয়; তাহার পর অনেক বিচ্ছেদের অর্থাৎ ডাইবোর্শের মোকদ্দমার সূত্রপাত জাহাজেই হইয়া থাকে, এ কথা যখন শুনিলাম, তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। জাহাজে অনেক মেম থাকেন, দর্পণ আমার অতিশয় চাটুকার, এবং বঙ্গবাসীরা পুরুষ হওয়া দূরে থাকুক মানুষের মধ্যে গণ্য নয়——তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন, সুতরাং আমার ভয়ের যে বিশেষ কারণ ছিল, ইহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; নিরাপদে আমি তীরস্থ হইয়াছি। আমার স্বীকার করা উচিত যে আসিবার সময়ে আমি চাঁদনি হইতে যে এক যোড়া নূতন জুতা কিনিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা এক খানা রবিবারের মিররে জড়ান ছিল; জুতা যোড়াটি যখন তখন খুলিয়া দেখিতাম, সুতরাং মিররও একটু আধটু পড়া হইত। যাহারা মনে করিবে যে ইহাতে ধর্ম্ম সঞ্চার

হইতে পারে না, এবং এই মনে করিয়া বিদ্রূপ করিবে, তাহারা পাষণ্ড, নাস্তিক। প্রমাণ স্বরূপ একটা গল্প বলি, ক্ষমা করিবেন।

হলা ডোম ছেলেবেলা অবধি অতি দুষ্ট প্রকৃতি ছিল। জলার ধারে মানুষ ঠেঙ্গাইবার মতলবে হলা বরাবর বসিয়া থাকিত। এক দিন মানুষ দেখিতে না পাইয়া হলা ঢিল ছুড়িয়া একটা বককে মারিল; বকের গায়ে ঢিল না লাগিয়া জলে পড়িল, সেই জল ছিট্‌কিয়া একটা তুলসী গাছে লাগিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত হলা কখনও কোনও সৎকর্ম্ম করে নাই।

ক্রমে হলার মৃত্যু হইল; যমের কাছারীতে চিত্রগুপ্ত পাপ পুণ্যের খাতা খুলিয়া দেখিলেন, পুণ্যের মধ্যে হলা এক দিন তুলসী গাছে জল দিয়াছিল (সেটা উপরে বলা হইয়াছে) তদ্‌ভিন্ন সমুদয়ই পাপ। সেই তুলসী গাছে জল দেওয়ার দরুণ, যম হুকুম দিলেন, হলা এক বার বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-মন্দির দেখিতে পাইবে আর অবশিষ্ট কাল তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে। হুকুম শুনিয়া হলা যমরাজকে বলিল—"মহারাজ, চিরকাল নরকে থাকিয়া শেষে কবে বিষ্ণু-মন্দির দেখিব তাহার ত স্থিরতা নাই; তাই নিবেদন করিতেছি যে যদি বিষ্ণু-মন্দিরটাই প্রথমে সারিয়া লইতে, দেন ত আমার পক্ষে ভালো হয়; শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া নরকে থাকি।" প্রার্থনা সঙ্গত দেখিয়া যম বলিলেন—"তথাস্তু।" অমনি বিষ্ণুদূত আসিয়া হলাকে স্কন্ধে আরোপণ করতঃ লইয়া চলিল।

কিয়দ্দূর গমনানন্তর বিষ্ণুদূত বলিল—"ঐ দেখ্, হলা, ঐ বিষ্ণু-মন্দির দেখা যাইতেছে"। হলা বলিল—"বাপু বিষ্ণুদূত! চক্ষের যদি সে জ্যোতিই আমার থাকিবে, তাহা হইলে, এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন?

আরও কতকদূর গিয়া বিষ্ণুদূত

আবার সেই রূপ দেখিতে বলিল। হলা উত্তর দিল যে—"তোমাদের যদি বেগার দেওয়া হয়, তবে আমাকে ফিরাইয়া যমের বাড়ী লইয়া চলো। আমি আগেই বলিয়াছি আমি অন্ধ, তবে আর আমাকে দূর হইতে দেখিতে বলিয়া ফল কি?"

বিষ্ণুদূত লজ্জিত হইয়া বিষ্ণু মন্দিরের যত নিকটবর্ত্তী হইয়া হলাকে দেখিতে বলে, হলাও তত অন্ধের ভাণ করিয়া দেখিতে অস্বীকার করে। ক্রমে ঠিক বিষ্ণু-মন্দিরে যেই উপস্থিত হইয়াছে, অমনি বিষ্ণুদূতের স্কন্ধ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া হলা বিষ্ণু পাদস্পর্শ করিল। হলার তৎক্ষণাৎ মোক্ষ এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইল; যে যমদূতেরা হলাকে আনিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল, এবং যমরাজ ও বিস্ময়ের সহিত খাতায় হলাকে খাস্তা খরচ লিখিয়া রাখিবার জন্য চিত্রগুপ্তের প্রতি আদেশ করিলেন।

সে কালে হলা তেমন করিয়া তুলসী গাছে জলসেচন করিয়া উদ্ধার পাইয়াছিল; আর এ কালে আমার উক্তবিধ মিরর্ পাঠে মোক্ষ হইবে না, ইহা অসম্ভব।

ফলতঃ বিলাত পৌঁছিয়া আমার দুঃখের কতক নিবৃত্তি হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে এত দিনে ভারতবর্ষে যে জাতিকে সাহেব বলিয়া ভয়ে তটস্থ হইতাম, এবং যাহারা নেটিব বলিয়া আমাদিগকে নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিত, এখানে আসিয়া অষ্টপ্রহর সেই জাতির সঙ্গে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে দহরম মহরম করিতেছি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এখন অবধি যে সকল কথা আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব তাহাতে নেটিব বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করিব। "নাও পর্ গাড়ী, গাড়ী পর্ নাও" চিরকাল শুনিয়া আসিতেছিলাম,

এত দিনে সে কথাটা সার্থক হইল। আমার নেটিবগণ আপনাদের ভক্তি-ভাজন সাহেব, এ কথা মনে হইলে প্রতিশোধ প্রবৃত্তির পরিপূরণ জন্য আমার আহ্লাদ হয়, এবং আপনারা আমার হিংসা করিবেন, ভাবিয়া আরও আনন্দের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এখানে আসিয়া কয়েক জন নেটিব ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে; এবং আমি মহাশয়ের ন্যায় রসরাজের চিহ্নিত ব্যক্তি জানিয়া সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা ও যত্ন করিতেছেন।

একটা সুলক্ষণ দেখিতেছি যে নেটিবগণ বিদ্রূপের ভয়ে অতিশয় ভীত; ইহাদের চামড়া খুব পাৎলা, সহজেই বিদ্ধ হয়। আমাদের দেশে লোকের চামড়া গণ্ডারের মত পুরু এবং অভেদ্য; যত কেন তীব্র বিদ্রূপ করুন না, তাঁহাদের গায়ে কিছুতেই লাগিবে না। মনে করুন, আইনের নিষেধ জানিয়াও একজন আমাদের দেশী উকীল পূজার সময়ে মোক্তারদের ডাকিয়া পার্ব্বনি বলিয়া সংবৎসরের দশক্তরা বা মোক্তারানাটা মিটাইয়া দিয়া থাকেন। আপনি "শনিবারের পালা" লিখিলেন, উকীল বাবু হয় ত পড়িলেনই না, কিম্বা যদি পড়িলেন, তবে ভ্রূক্ষেপই করিলেন না, উল্‌টিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া দিলেন। তাহার পর যদি তাহাকে বেহায়া, নীচ-প্রকৃতি, পাজি, নচ্ছার, দুরাচার বলিয়া অপদস্থ করিবার কামনা করেন, সেও বৃথা হইবে; নাম ধরিয়া না বলিলে বাবু চটিবার লোক নহেন।

কিন্তু এখানে নেটিবদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপ। অমন তরো একটা কথার ইঙ্গিত যদি এখানে হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, সকল উকীলে যুটিয়া সেই পাল-নষ্ট-কারী কৃষ্ণ মেষকে শিকার করিয়া বাহির করিবে, তবে ছাড়িবে; সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় ক্ষিপ্তের ন্যায়

হইয়া উঠিবে, যতক্ষণ প্রতীকার না হয়, ততক্ষণ জলগ্রহণ—এ দেশে ব্রাণ্ডীগ্রহণ—করিবে না। এই দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে। হয় ত নেটিবদের আমি ভালো বাসিয়া ফেলিব। যাহা হয় পর পত্রে টের পাইবেন।

রাজকার্য্যের রহস্য।

জেলার জজ সাহেবেরা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত গুরু দণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহেন। অনেক সাহেব অপরাধ করিলে শাস্তিস্বরূপ জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভুক্তভোগী, সুতরাং দণ্ডের ব্যবস্থা ভালো বুঝিবেন বলিয়াই এ প্রকার ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

এক জন বাঙ্গালী অতিরিক্ত-জজ হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোনও বিষয়ে স্বয়ং দণ্ডিত হন নাই। বোধ হয় সেই জন্যই তাঁহাকে দাওরার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না।

আশ্চর্য্য অজ্ঞতা।

মেম সাহেব (খানশামাকে)—গত রবিবারে সাহেব তোমাকে মারিয়াছিলেন? কৈ, আমি ত জানিতে পারি নাই?

খানশামা।—আপনি জানিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়াছিলাম।

পঞ্চানন্দের গান।

দে গো তোরা দে, আমায় দে, বিলাত পাঠা'য়ে।
রাজনগরে কর'ব ভিক্ষে গলাবাজি করিয়ে।

কোটে দে গো অঙ্গ ঢাকি,
কালো বরণ লুকিয়ে রাখি,
হাতে মুখে সাবান মাখি,
কালো জনম ভুলিয়ে।

নে গো ঢিলে ধুতি খুলে,
নেটিব আর র'ব না মূলে,
ভর্ণাকুলার যা'ব ভুলে
চেয়ারে পা ঝুলিয়ে।

মিসেস্ পাঁচী গাউন্-পরা,
ধরাকে দেখিবে সরা,
হ'ল হ'লই উল্কী পরা,
নেবে ত বিবী হ'য়ে।

পাঞ্চা-নন্দ

দ্বিতীয় কাণ্ড] সন ১২৮৭ সাল। [১ম খণ্ড।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

দুই প্রহরের কাজ সমস্ত দিনমানে সম্পন্ন করিয়া পঞ্চানন্দ এক কাণ্ড সাঙ্গ করিয়াছেন। এখন এই দ্বিতীয় কাণ্ডে আরোহণ করিয়া ভূতের সুখ দুঃখটা ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। তাই একবার দেখা যাউক।

দেবতাই হউন, আর মানুষই হউন, সংসারে মুরুব্বি নহিলে চলিবার যো নাই। তুমি হাজার বিদ্বান হও, যত খুশি বুদ্ধিমান হও, সব সময়ে সব কাজ উদ্ধার করিতে কিছুতেই পারিবে না; তখন অপরের সাহায্য অপরিহার্য্য। তাহা যদি পাওয়া যায় তবে কাজ হইবে, নতুবা হায় হায় নিরুপায়। কিন্তু সকলেই জানে যে বাঙ্গালার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, বাঙ্গালীর সাহস নাই, সামর্থ্য নাই। তবে যে দুই প্রহরের কাজে সারা দিন লাগে, তাহাতে আর দোষ কি? দোষ হইলেই বা চারা কি? বরং কাজটা যে সারা গেল, সেই বাহাদুরি।

যাহারা মনের কথা কলমের মাথায় আনিয়া ছাপাখানার প্রতিপালন করে, আর দশের তিল সংগ্রহ করিয়া নিজের তাল পাকাইবার চেষ্টা করে, "গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক, বর্গকে ধন্যবাদ"

" ভ্রম প্রমাদ জন্য ক্ষমা, ত্রুটির নিমিত্ত মার্জ্জনা প্রার্থনা " করিবার একটা নিয়ম তাহারা ঘরে ঘরে করিয়া লই-য়াছে। পঞ্চানন্দ এখন স্বেচ্ছাবশে এই নিয়মের দাস ; অতএব মামুলী কাজটা তিনি করিবেন, সেই কৈফিয়ং বলো, যাই বলো, একটা তিনি দিবেন।

বঙ্গ সংসারে পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল যে রঙ্গভঙ্গের জন্য পঞ্চানন্দ থাকিবে, তাহা নয়, সে ত হরবোলার কাজ, ভাঁড়েব কাজ। হো হো করিয়া হাসান যে পঞ্চানন্দের কাজ, তাহাও নয়, কুতুকাতু দিলেই ত অনেকে হাসিয়া গলিয়া যায়। পঞ্চানন্দের প্রয়োজন গুরুতর,—ভ্রমের বিকৃত মূর্ত্তির চিত্র প্রদর্শন, অসারতার মর্ম্মোদ্ঘাটন, ভাষার পুষ্টি সাধন, প্রকৃত দেশহিতৈষিতার উৎসাহবর্দ্ধন—তদ-ভাবে পাঁচটা লোক প্রতিপালন এবং নিজের কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন—ইহাই পঞ্চানন্দের প্রয়োজন। তুমি বিদ্যার ভাণ্ডারী, জ্ঞানের কুবের, তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু এক আর একে দুই হয়, ইহা যে বুঝিতে পারে, সেও এখন বুঝিতে পারিবে যে পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে। নহিলে, আবির্ভাব কেন?

যাঁহারা পঞ্চানন্দের পরম বন্ধু, তাঁহারা একটা অনুযোগ করিয়া থাকেন, সেটার উল্লেখ অগ্রে করা আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে পঞ্চানন্দের অনেক কথা বোঝা যায় না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিব দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ তোমাদের বুদ্ধির, আর দোষ তোমাদের ভাষার। বাস্তবিক কিন্তু অনুযোগটাই অমূলক; বাঙ্গালা ভাষা বুঝিলে নাকি ভারি নিন্দার কথা, সেই জন্য বুঝিয়াও অনেকে বলেন যে বোঝা গেল না। তাহার এক প্রমাণ এই যে, ক্ষুদে কাঁকড়া, ছেলে ছোকরা পালে পালে দলে দলে যখন টৌন হলে রাজ-নীতির বিষম সমস্যার বিজাতীয় বিতণ্ডা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে,

তখন ত কেহ বলে না যে আমি বুঝি না, তবু আসিয়াছি ; বাগ্মীও বলেন না যে কেহ বোঝে না, তবু আমি বকিতেছি ! ভাই, আসল কথা কি জানো, পঞ্চানন্দ না কি বাঙ্গালা তাই অনেকে বুঝিতে পারে না। আর তা ছাড়া, যে ব্যথা বোঝে না, সে কি কথা বুঝিতে পারে ?

এমন কতকগুলি লোক আছে যাঁহারা পঞ্চানন্দে রস দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে প্রথমত এই বলা যাইতে পারে যে এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে পুকুরের জল শুখাইয়া যায়, হৃদয়ের রক্ত শুখাইয়া যায়, জিহ্বায় ধূল উড়ে, এমন অবস্থায় পঞ্চানন্দ কেমন করিয়া রসে টলমল করিবে ? তাহার পর, যে রস আছে, তাহা মজ্জাগত। যাহারা রসের ব্যবসা করে, তাহারা মহারুক্ষ খেজুর গাছের গলা কাটিয়া রস বাহির করে। রস চেনা চাই, রসগ্রাহী হইতে জানা চাই।

একটা ত্রুটীর কথায় পঞ্চানন্দ কবুল জবাব দিতে প্রস্তুত। ইচ্ছা না থাকিলেও, কামনা না করিয়াও কালে ভদ্রে ভদ্র লোকের মনে পঞ্চানন্দ আঘাত করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেটা অনিবার্য্য। এই ত বড় লাটের ছেলে এ দেশে শিকার করিতে আসিয়া দুইটা মানুষকে গুলি করিয়া ফেলি- লেন ; কিন্তু তাই বলিয়া কি রাগ করা উচিত ? এ সব যে দুর্ঘটনা, ইহার জন্য দুঃখ করিতে হয়, করো, কিন্তু রাগ করিও না। বাস্তবিক অনেক সময়ে, অনেক স্থলে মানুষ কি পশু ঠাওরান যায় না ; আর শেষে যদি ঠাওর হয়, তখন নিরুপায়, আর সারিবার আয় থাকে না।

অতএব, আইস ভাই, সকলে মিলিয়া—

১। মুদ্রণ বিধি উঠাইবার জন্য প্রার্থনা করি।

২। নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা করি।

তা কাজকর্ম্ম, ছাড়িয়া বক্তৃতা ঝুড়িয়া দিই।

৪। চাকরি লক্ষ্য করিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিই।

৫। আড়াই টাকা দিয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহক হই।

জিজ্ঞাসা।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী"কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। কিছু দিন হইতে গো জাতির উন্নতির জন্য "সঞ্জীবনী" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রথমত, এই সমস্ত প্রবন্ধ গো জাতির অবোধগম্য এবং গোপাল সম্প্রদায়ও প্রবন্ধ পড়ে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

দ্বিতীয়ত, গোজাতির অগ্রে স্বজাতির উন্নতির জন্য যত্ন করা উচিত এবং আবশ্যক। তবে, যদি "সঞ্জীবনীর" গোজাতি এবং স্বজাতি একার্থ বাচক হয়, তাহা হইলে কথাই নাই।

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

—০:০—

ADDRESS TO THE JURY.

অর্থাৎ

জুরি সম্বোধন।

জুরী মহাশয়গণ,

একটা লোক গুরুতর অপরাধ করিয়াছে কি না, এই কথার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আপনারা এখানে আসিয়াছেন। আপনাদের বিদ্যার জোরে কিম্বা বুদ্ধির ফেরে যে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহা নয়; জজ সাহেব আইন বুঝাইয়া দিবেন, সাক্ষীরা ঘটনার কথা বলিবে, উকীলেরা সাক্ষীদের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিবেন, কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা প্রাণপণ করিয়া দেখাইয়া দিবেন, তাহার পর আপনারা বলিবেন, হাঁ এ লোকটা দোষী বটে, কিম্বা বলিবেন, না এ দোষী নয়।

কাজটা সহজ, কিন্তু যত সহজ মনে করিয়া, জুরীপতি মহাশয়! এই আদালতের কড়ি বরগা গুলি বারংবার

গণনা করিতে আপনার গোটা মনটা সুংলগ্ন করিয়াছেন, তত সহজ নহে। অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়টা শুনুন, একবার আমা পানে চাহিয়া দেখুন।

আইনকর্ত্তারা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন, যে আপনাদিগকে ডাকিয়া, আপনাদের অভিপ্রায় জানিয়া তবে জজ সাহেব এক ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া ঠিক করিবেন। আইনে লেখা আছে বলিয়াই জজ সাহেব আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন। আর, আপনারা না কি দেশের অবস্থা জানেন, লোকের ব্যবহার জানেন, কেন লোকে মিথ্যা বলে, কি হইলেই বা সত্য বলে এ সকল জানেন; সেই জন্যই আইনকর্ত্তারা বলিয়াছেন যে অপরাধের বিচার করিতে আপনাদের থাকা চাই।

ওঁ, জুরী মহাশয়! টানা পাখার বাতাস ঠাণ্ডা লাগে কি না, মিষ্ট লাগে কি না, এ বাতাস গায়ে লাগাইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ঘুম আসে কি না, ইহা দেখিবার জন্য ত আপনাকে এখানে আনা হয় নাই; তবে কোন বিবেচনায়,—ও জুরি মহাশয়!—জুরি মহাশয়!—বলুন দেখি, তবে কোন বিবেচনায় চক্ষু লজ্জার মাথা খাইয়া আপনি নাসিকা ধ্বনি করিতেছেন?

সাক্ষীরা বলিয়াছে যে আসামী ফরিয়াদীর গাঁয়ে দলাদলি আছে। এ দেশে, দলাদলি থাকিলে, এক দলের লোক অন্য দলের লোককে জব্দ করিবার জন্য হুঁকা বারণ, নাপিত বন্ধ, কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, মারামারি—কত কি যে করে, তাহা আপনারা জানেন। এই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের কথা শুনিয়া, সেই দলাদলির ব্যাপারটা মনে করিয়া, আপনাদিগকে স্থির করিতে হইবে যে আসামী সত্য সত্যই দোষ করিয়াছে, না কি সেই দলাদলির দরুন, মিছামিছি ইহার নাম করিয়া দিয়া সাক্ষীরা

আপন দলের বাহাদুরি বজায় রাখিতে আসিয়াছে?

না জুরী মহাশয়! আপনি যদি দাদার বোলে মোর বোল, জুরীপতির যে অভিপ্রায় হইবে, আমি তাহাতেই সায় দিব, কিম্বা জজ সাহেব যে দিকে চলাইয়া দিবেন আমি সেই দিকে চলিব, এই রূপ মনে করিয়া ঘরকন্নার কথা ভাবেন, আমার কথায় মন না দেন, তাহা হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রত্যেককে নিজের মত স্থির করিতে হইবে। সঙের মতন বসিয়া থাকিবার জন্য আপনি এখানে আইসেন নাই, আদালতে তামাসা দেখিবার জন্যও আইসেন নাই। কোথায় কে হাঁচিল, ঐ লোকটা কেন হাসিয়া উঠিল, বাহিরে ঠক ঠক করিয়া কিসের শব্দ হইতেছে—এ সব কথা মনে করিলে চলিবে না। এ মোকদ্দমাটা হইয়া যাউক, তাহার পর দশ দিন উপরি উপরি আদালতে আসিয়া আপনি মজা দেখিয়া যাইবেন, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না। কিন্তু আজি অমন হাঁ করিয়া থাকিলে আমি মারা যাই। একটা লোকের ধন, প্রাণ মানের কথায় অমন করিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলে অধর্ম্ম হয়। অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা ত জানেন?

প্রথমত যখন আসামীকে মেজেষ্টরের কাছে ধরিয়া আনা হয়, তখন সে কবুল করিয়াছিল; এখন বলিতেছে যে পুলীশের মারের চোটে সে কবুল করিয়াছিল, কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম সে এ পাপে ছিল না। একবার কবুল করিয়াছিল বলিয়াই যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সে কাজে আপনাদিগকে এখানে না আনিলেও ক্ষতি হইত না। তবু যে আপনাদিগকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে একরার করিলেই সব গোল চুকিয়া যায় না। একটা ঘটনা হইলে তাহার কিনারা করিতে না পারিলে পুলিশের বদনাম হয়, তাহা আপনারা জানেন; কাজে কাজেই এক প্রকার

দায়গ্রস্ত হইয়া কখনও কখনও পুলিশ যে ছাড়ি কাঠে যেটা সেটা একটাকে টানিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, ইহা অসম্ভব নয়; আর সে রকমে টানিয়া ফেলিতে হইলেই হয় ডুটো ফ্রাঁকি ফুঁকি দিয়া ভুলাইতে হইবে, নয় যেখানে মন্ত্র তন্ত্র ছিটা ফোটায় কাজ না হইল, সেখানে গুঁতো গাঁতাটা বসাইতে হইবে। এখন আপনাদিগকে বলিতে হইবে যে এ লোকটার একরার কি গুঁতোর দরুন, না কি লোকটা বড় ধার্ম্মিক, পাপ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারে নাই, সব বলিয়া ফেলিয়াছে, সেই দরুন?

বেলা যাইতেছে, তাহা আমি জানি, এই তিন দিন আপনার দোকান বন্ধ, আর আপনার তাঁত কামাই, তাহাও আমি জানি। কিন্তু যখন আসিয়াছেন, হলফ করিয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, তখন বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? হলফের অর্থ আপনি জানেন না, লেখা পড়ার মধ্যে আপনি ঢেরা সই করিয়া দুই খানি তমঃস্সুক লিখিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমি জানিলেই বা কি হইবে? এখন যে আপনারা বিচারক; যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগকে বিচার করিতেই হইবে। আমি ব্রাহ্মণ, লেখা পড়া জানি, বড় লোক,—যথার্থ; আমি আপনাকে আপনি আপনি বলিলে আপনার মন খড় ফড় করে, প্রাণে কষ্ট হয় তাহাও জানি। কিন্তু আপনি এখানে দোনা ময়রা নহেন, আপনিও গুপে মুদী নহেন, এখন আপনাদের আসনকে আমিও সম্মান করিতে পারি, তাহাতে দোষ হয় না। আপনারা বোকা, মুর্খ, কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইলেও এখন দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। অতএব যথাসাধ্য আমার কথা কয়টা শুনিয়া, মন দিয়া বুঝিয়া আপনারা সকলে বলুন —এ ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেই আপনারা ধর্ম্মে খালাশ; তাহাতে যদি অবিচার

হয়, সে পাপের ফল ভুগিবেন—যিনি আপনাদের ডাকেন, তিনি।

না, আপনাদের কাছে বকাবকি করা, কেবল ঝকমারি। আপনাদের কর্ম্মভোগ, তাই এখানে আসিতে হয়; আর, আমারও পোড়া কপাল, তাই কথা কহিতে হয়। আমি ক্লান্ত হইলাম, আপনারাও বাড়ী যান।

——০০——

অবৈধ অনুযোগ।

বাঙ্গালীর দেশহিতৈষিতা নাই, এই কথা বলিয়া অনেককে অনুযোগ করিতে শোনা যায়। কিন্তু কথাটা সত্য নহে, সুতরাং এ অনুযোগও অমূলক। খোলা ভাটী হইবার পূর্ব্ব হইতেই "কণ্ট্রি" নামে অনেকের মুখ লালায়িত এবং হৃদয় প্রফুল্ল হইতে দেখা গিয়াছে। তবে যাঁহারা "কণ্ট্রি" কথার বদি করেন, তাঁহারা অবশ্যই বিলাতী ভক্ত এবং দেশের পরম শত্রু।

—•—

কবির ভবিষ্যদ্বাণী।

পাঁচ ইয়ারে একত্র হইলেই একটা মদের বোতল খোলা আবশ্যক, নহিলে আর ভদ্রতা রক্ষা হয় না। নসী বাবুর বৈঠক খানায় এই রূপ মজলিশ হইয়াছে, খানশামা এক বোতল "বী-হাইব ব্রাণ্ডী" দিয়া গেল। নব অনুরাগী এক জন নবীন ইয়ার "ব্রাণ্ডীর" নাম শুনিয়া চমকিয়া বলিল—"না ভাই, আমাদের বাঙ্গালীর পেট, ব্রাণ্ডী খাওয়াটা উচিত নয়।"

নসী বাবু বলিলেন—"বী-হাইব" জিনিশটা ভালো হে; এতে কোনও অনিষ্ট হয় না।"

এক জন বকেয়া ইয়ার নসী বাবুর পোষকতা করিয়া বলিল—"বী-হাইব, কি না, মধু-চক্র,—বাঙ্গালীর জন্যই ইহার সৃষ্টি, আর বাঙ্গালীর জন্য ব্যবস্থাও আছে। দূরদর্শী কবিবর মাইকেল দত্তজ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—

——'মধু চক্র, গৌড় জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।—

যদি ভদ্র লোক হও, স্বদেশানুরাগী হও, তবে বী হাইবের নিন্দা করিতে পারো না।

——

সিংহ, নেকড়ে বাঘ ও মেষপাল।

(বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ হইতে উদ্ধৃত)

সিংহ। (একতম মেষের পেট চিরিতেছে, এমন সময় নেকড়ে বাঘের প্রবেশ)। "তুমি কে?"

নেকড়ে। "হুজুর আমি ক্ষুদ্র জমিদার। (মেষপালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এগুলি কি মহারাজের খাশের প্রজা?

সিংহ। "হাঁ, ইহারাই ... প্রজা। তোমার প্রয়োজন কি?"

নেকড়ে। "ধর্ম্মাবতার! আমি প্রজাপালন ... শিখিতে আসিয়াছি।"

খেয়াল সম্বাদ।

বহিছে বাসন্তি বায়ু। মরিছে শিহরি,
বিরহে বিরহীকুল,—নিষ্কর্ম্মার গুরু।
রাগেতে ভৈরবরূপী খরকর রবি
উঠিয়াছে শিরোপরি। এ হেন দুপুরে,
প্রকাণ্ড প্রান্তর মাঝে, বটবৃক্ষ মূলে,
ভবের ভাবনা ভুলি, গঞ্জিকার ঘোরে
ভোর হয়ে পঞ্চানন্দ বিরাজেন একা।
দুই মুখা ছোটো হুঁকা, (কলি পরিপাটী)
—ক্ষুদ্র অবয়ব এক কলিকা শিরসে
শোভে যার (শোভে যথা মাধবের শিরে
এক গুচ্ছ শিখিপুচ্ছ,) গাঁজা এক আটি,
তুচ্ছ খোলা ভাটি যাহে,—আর সরঞ্জাম,
আপনি আঞ্জাম করি রেখেছেন কাছে।
নহে নিদ্রাগত দেব, নহে জাগরণে—
রাঙা আঁখি, থাকি থাকি, টানিয়া, টানিয়া,
আধ মুকুলিত, পুনঃ মুদিত তখনি
হইতেছে; শুয়ে প্রভু সটান হইয়া,
বটমূলে রাখি মাথা, স্থূল কাণ্ডদেশে
তুলিয়া চরণযুগ (ধ্বজ বজ্রাঙ্কিত
বিনামা অভাবে গদা); পত্র ভেদ করি,
খেলিছে রবির ছটা কুঞ্চিত ললাটে।
সহসা খেয়াল আসি প্রণমিল পদে;
নিবেদিল করপুটে—"গেঁজেলের গুরু,
কত যে ভকত তব, কত জন মন
যোগাইতে এই দাসে করেছ নিয়োগ,
নহে অবিদিত তব। বংশধর যত
ভুভারতে ভারতীর, তারা ত স্মরিতে
অবশ্যই পারে মোরে, স্মরেও সর্ব্বদা,
কিন্তু প্রভু আছে যত কর্ম্ম-কাণ্ড হীন,
অকাল কুষ্মাণ্ড ভণ্ড জগতের মাঝে
—মরুর সিকতা সম চির বেসুমার—
করিতে তাদের সেবা লাঞ্ছনা যে কত,
কি আর কহিব প্রভু? বাঞ্ছা নাহি চিতে
করিতে তাদের পাপ মুখ বিলোকন।
নিতান্ত ভকত তব, তেঁই খাটি আমি
তোমার খাতিরে প্রভু ভূতের খাটুনি।"
"স্থির হও, স্থির হও, ভকত প্রধান"—
কহিলা খেয়ালে প্রভু—"ভূত নাচাইতে,
তোমারে নিযুক্ত কেন করিয়াছি বলো,
তুমি না সহিবে যদি ভূতের উৎপাত?
রাজা, রায় বাহাদুর, ভারততারকা,
ভারত-মুকুট আদি যত ভূত আছে,
সুযোগ্য নায়ক তুমি, পূজ্য সবাকার
ভূভারতে, ভারতীর ভকত যাহারা
বঙ্গদেশে, ধরে প্রাণ তোমার আশ্রয়ে;
তুমি যদি করো রাগ কে আর রাখিবে,
এত অর্ব্বাচীনগণে—(শিশুর অধম)—
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা তুমি বঙ্গের গণেশ?"
নীরবিলা পঞ্চানন্দ, শান্ত ভাব ধরি
হাসিল খেয়াল এবে গরবের ভরে
নিকাশি দুপাটি দাঁত বদন-গহ্বরে,

মধ্যাহ্ণে পশিলে যথা গৌরকর রাশি
শার্দ্দুল বিবরে হায়, প্রকাশে আপনি,
ভীষণ কঙ্কাল পূর্ব্বকালে কবলিত।
ভূতেশ আদেশ পুনঃ করিলা খেয়ালে
—"নির্ধম কলিকা এবে, দাও সাজাইয়া
আরবার, দেখিব রে আঁখি ভরে' তোর
ভালবাসা মুখ খানি—আঁধারের মণি!
শুনিব সুমুখে তোর কেমনে মরতে
গৌরী-আরাধনে করে আমার সম্মান?
কি রঙ্গে, সে রঙ্গময়ী বঙ্গ ভুমে গিয়া,
ভব-সঙ্গ ভুলে থাকে, কোন সুখ পেয়ে?
আছে কি পূজার বিধি যথা পূর্ব্বাবধি?"
যথা আজ্ঞা, তথা কাজ; সেবক প্রধান
যোগাইল দেব সুধা বাষ্প যন্ত্র যোগে।
ঢালিয়া সুধার ধারা প্রভুর শ্রবণে,
আরম্ভিল গৌরী গান একতান মনে।
"নাহি আর সেই দিন, পঞ্চানন্দ প্রভু,
বঙ্গদেশে; বৎসরেক শেষে যথা আগে
পূজিত সে বঙ্গবাসী, তিন দিন ধরি,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, নানা ঘটা করি,
ঘটে বা প্রতিমা গড়ি, সবলবাহনে
গিরিজারে; মহালক্ষ্মী, তথা বীণাপাণি,
গণপতি, কার্ত্তিকের (রূপে রতিপতি),
পশুপতি মহাসিংহ, মূষিক, ময়ূর,
অসুর সহিত যবে সবে সমভাবে
পাইত হে ভোগরাগ, পাইত সে পূজা।
কাহারও নাহিক মান, গৌরীর সমান
এবে বঙ্গদেশে, এবে অনন্ত উৎসব
বারো মাস নিতি নিতি ঘরে ঘরে হয়।
পরমা শকতি গৌরী, গুহ গজাননে,
এত দিনে দিয়াছেন, যার যে সম্মান।
—এখন কুমারবর শক্তিধর তাঁর
পাইতেছে অগ্রভাগ সকল পূজার,
শক্তি অভিভূত শাক্ত শক্তি চিনিয়াছে।
গজেন্দ্রবদন পুত্র গণপতি এবে
মৃগেন্দ্রের ভয়ত্রস্ত; নাহি লম্বোদর
নাহি সে বিপুল কায়,—মূষিক সহায়ে
মাটী কেটে মাটী হয়ে মাটীতে মিশিয়া
কষ্টে শ্রেষ্ঠে কোন মতে কাটাইছে দিন।
অসুর অমর, তাই কখন কখন
নাগ পাশে মোড়া দিয়া, শূল সরাইয়া
সিংহের বিক্রম ভুলে, আক্রমণ তার
এড়াইতে, চাড়া দিয়া ওঠে মাথা নাড়ি;
কিন্তু বৃথা! সাথে যার সশস্ত্র কুমার,
মৃগেন্দ্রবাহিনী কাছে, সাজে কি বিক্রম?
কমলা—গৌরীর দাসী, আর নাহি পায়
দেবী সমাসনে স্থান; অচলা ভকতি,
শক্তি প্রতি এবে তার; ত্যজি বঙ্গদেশ,
অশেষ বিশেষ মতে গৌরীর আদেশ,
সাগর বা সিন্ধু পারে পালিছে কমলা।
কি কব অধিক দেব, বীণাপাণি এবে
মহামন্ত্র গৌরী তন্ত্র শিখিয়া যতনে,

গলায় কুঠার বাঁধি, কণ্ঠ কাঁপাইয়া,
শক্তি গুণ গাহেন সদা, ভক্তি ভাবে রত।
পুলকে পূরিল তনু, দেখিয়া ত্রিলোকে,
অক্ষুণ্ণ দেবীর শক্তি, শকতির সেবা।"

——০ঃ০——

সুশিক্ষিত
এবং
অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য।
(চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ হইতে উদ্ধৃত)

পরমকারুণিক পরমেশ্বর মানব জাতিকে যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, অহং সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক তাহার এক মাত্র অধিকারী। তুমি অশিক্ষিত বর্ব্বর তোমার এ সমস্ত গুণ না থাকাপ্রযুক্ত তুমি নিয়ত দুর্বিষহ যন্ত্রণা জালে জড়িত হইয়া যৎকথঞ্চিৎ রূপে জীবন যাপন করিতেছ মাত্র। তোমার ঐশ্বর্য্য নাই, তোমার আধিপত্য নাই, তোমার গাড়ী ঘোড়া নাই, তোমার বাড় লাঠান নাই, তোমার এ সমস্ত কিছুই নাই, আমার আছে! তোমার সেই অদৃষ্ট দুর্ভাগ্য, আমার সৌভাগ্য। দেখ আমি স্কুল কলেজে নাম লেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া এখন হাকিম হইয়াছি, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু উকীল হইয়াছেন। আমি মাসান্তে মোটা মাহিয়ানা পাইতেছি, আমার বন্ধু অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের সুখের সীমা কি? আমাদের এখন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কষ্ট নাই; পৃথিবী ভাসিয়া গেলেও আমাদের ভাবনা নাই। তুমি মনে করিতেছ যে হাকিমকে ভূতের খাটুনি খাটিতে হয়, সকল সাহেবের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; তুমি মনে করিতেছ যে উকীল পয়সার গোলাম, মোক্তারের লাঙ্গুলে তৈল মর্দ্দন না করিলে ইহার দিনপাত হয় না, অতএব ইহাদের জীবন বড়ই দুঃখময়। কিন্তু তুমি বোকা তাই এরূপ মনে করিতেছ। যদি সত্য সত্যই ইহা দুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে চাকরির জন্য দেশ সুদ্ধ লোক লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত না, ওকালতির আশায়

মাথা কুটিয়া মরিত না। বাস্তবিক তুমি যাহাকে, নির্বুদ্ধিতা হেতু, কষ্ট মনে করিয়া থাকো, তাহা সৌভাগ্য ভোগের উপাদেয় চাট্নি মাত্র, তাহাতে সৌভাগ্যের সুস্বাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে সুশিক্ষিত হইবার নিমিত্তেও বিশেষ কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। আমরা পরীক্ষা দিয়া উপাধি হাসিল করিয়াছি সত্য, কিন্তু যে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার পিণ্ডান্ত করিতেছি; যে গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞানে পরীক্ষককে তুষ্ট করিতে হইয়াছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীগঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি, অথচ পক্ষান্তরে মাতৃভাষার পদসেবা আমাদিগকে করিতে হয় নাই, মাতৃভাষাও সাহস করিয়া কখনাও আমাদের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পরে নাই। সুশিক্ষিতের প্রধান সুখ স্বাধীনতা, আমরা অহরহ সে সুখ ভোগ করিতেছি।

আমরা যখন শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করি, তখন খানশামা তামাক সাজিয়া দেয়, খানশামা তেল মাখাইয়া দেয়, খানশামা স্নান করাইয়া দেয়, খানশামা কোঁচান কাপড় পরাইয়া দেয়; আমরা জড়ভরতের মত কেবল সুখেরই অনুভব করিতে থাকি; হস্তপদাদির পরিচালন মাত্র করিয়াও সহজে সুখের জীবন বিড়ম্বিত করি না। অপরাহ্নে আমরা যষ্টি হস্তে ভ্রমণ করি, সে বায়ু সেবনের জন্য; সন্ধ্যার পর পাঁচ জনে একত্র হই, সে মদমত্ত হইয়া খোশগল্প বা খেমটানাচের জন্য। আহার বিহারের জন্য আমাদের ভাবিতে হয় না, আমরাও ভাবি না। পড়া শুনা আমাদের আর করিতে হয় না, আমরাও করি না। দেশের দুঃখ আমাদিগকে দেখিতে হয় না, আমরাও দেখি না। দেশের কথায়

আমাদিগকে থাকিতে হয় না, আমরাও থাকি না। এখন আমরা কেবল খাই দাই নিদ্রা যাই, প্রবৃত্তি হইলে প্রকৃতির জল্পনায় কাল কাটাই। বাস্তবিক আমাদের কোনও বালাই নাই।

কিন্তু অশিক্ষিতের দুরবস্থা দেখ! অশিক্ষিত ব্যক্তি নিয়তই পরের অধীন। যে অশিক্ষিত ব্যক্তি নিরেট মুর্খ, সে পেটের দায়ে অস্থির। শুনিতে পাওয়া যায় যে এই সকল দুর্ভাগ্য মনুষ্য মাটী কাটিয়া, বা অন্য প্রকারে খাটিয়া খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া থাকে। অহো! কি বিভীষিকা! এ সকল লোকের মরিয়া যাওয়াই উচিত। ইহারা নাকি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন, সেই জন্যই বোধ হয় এ জীবনভার বহন করিয়া থাকে!

আর এক প্রকার অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, যাহারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর দেশ দেখিয়া থাকিলেও, কিছু মাত্র শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাদিগকে অর্দ্ধশিক্ষিত বলা যায়। ইহারা ইংরেজী পড়িয়াছে, সে নাম মাত্র, কারণ ইংরেজীতে ভুল করিয়া পত্রাদি লিখিতে পারে না, অথবা শুদ্ধ রূপে লেখেও না। এরূপ শিক্ষা কেবল শর্করবাহি বলীবর্দ্দের ভার বহনরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। অধিকন্তু ইহারা দেশীয় ভাষার চর্চ্চা করিয়া প্রকৃত শিক্ষা লাভের ফল হইতে বঞ্চিত থাকে, এবং তদ্ধেতু স্বার্থের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। ইহাদের শুভপরিণামের আশা সুদূরপরাহত।

সাধারণতঃ, উভয় দলের অশিক্ষিত ব্যক্তিরই এই এক ভয়ানক দোষ আছে, যে ইহারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, পরের অপেক্ষা না করিয়া কোনও কাজ করিতে পারে না। ইহাদের মনোমধ্যে একটা চিন্তার উদ্রেক হইলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত করে, নহিলে কোনও প্রকার মীমাংসা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভাব অন্য প্রকার। আমরা সময়

বুঝিয়া সাহেব সুবার সেবা করি বটে, কিন্তু আত্মার যাহাতে তৃপ্তি নাই, এমন কার্য্যের জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করি না। আমরা শরীরের সেবা করি, মনের সন্তোষ বিধান করি, বাক্যের সার্থকতা করি, অর্থাৎ যাহাতে বাক্যে অর্থাগম হয়, তাহার চেষ্টা করি! আমরা সুশিক্ষিত, সুতরাং বুঝিতে পারি যে—

" শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

—আমরা চুলে পমেড, গায়ে জামা, পায়ে বুট, হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া সম্মানের সংযোগ করিয়া লই। কিন্তু অশিক্ষিতগণ পরের জন্যই সদাব্যস্ত। তাহাদের পরকাল অনিশ্চিত, ইহকাল খাঁটি মাটী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—ঃ—

যে যেমন বোঝে।

" প্রকৃত সুন্দর কে ? "

" যাহার বিদ্যা আছে। "

" ইহার প্রমাণ কোথায় ? "

" ভারতে। "

ক্ষমা প্রার্থনার নব বিধান।

মৌশলির অতুল কীর্ত্তি 'ওরফে' বঙ্গজাতি ব্যাপার বোধ হয় এখনও কেহ বিস্মৃত হন নাই। সেই যে ছোট লাট লিখিয়া পাঠাইলেন যে বঙ্গজাতির জন্য জেলার মেজেষ্টর ডিপুটী মেজেষ্টরের সদনে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাহার ফলে মহামতি মৌশলি আদেশ করিলেন যে অতুলানন্দ বর্দ্ধন জন্য ডিপুটী তারিণী বাবু এই মর্ম্মে রুবকারি প্রেরণ করুন যে বঙ্গজাতির বদার্থ যত কেন বদ হউক না, তৎসম্বন্ধে বিবাদ করা বৃথা, কারণ অপবাদের অভিপ্রায়াভাব, অতএব অপরাধ অসম্ভাবিত।

এই ত গেল ক্ষমা প্রার্থনা; ইহাকে নব বিধান অভিধান দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আদেশ আছে, অনুতাপ আছে, গৌরাঙ্গ আছে, কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, ঈশার উপদেশানুসারে গণ্ডান্তরে চপেটাঘাত আছে, মহম্মদের শাসনানুগত করবালাঘাত আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য্য ঈড়েনাবতারের জয় পাতাকার উড্ডীনতা আছে।

এ হেন প্রয়াগ তীর্থে, এমন গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে যে ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডনে কুণ্ঠিত হয়, তাহার পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ, ইহকালের অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ, সকাল সকাল এ ভবজাল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহার মঙ্গল।

—ঃ—

বিদ্বজ্জন সমাগম।

সুখই স্বর্গ, আর যেখানে সুখ সেই স্বর্গ। যেখানে বিদ্বৎ—মণ্ডলী, যেখানে একপ্রাণ বহু জনের সমাগম, সেখানে যাহার সুখ না হয়, সে পামর, সে হতভাগ্য ;— তাহার অদৃষ্টে কুত্রাপি সুখ নাই, তাহার স্বর্গ লাভ কখনই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিতেই কি, আর মরিয়া গেলেই কি ?

যিনি কমলার কৃপাসত্ত্বেও ভারতীর চিহ্নিত সেবক, যিনি দুর্লভ মানব জন্মে দ্বিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য, তাঁহার আতিথ্যে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্য প্রভা, যেখানে মূর্ত্তিমতী প্রতিভা, যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ শোভা— সে যদি স্বর্গ না হয় তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দ স্বর্গবাসী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন সুতরাং মানবস্বর্গেও তিনি ইন্দ্রত্ব করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমাগমে তিনি মর্ত্ত্যের পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয় তাহার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইয়াছেন; অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্বরূপ এই লৌহলেখনী দ্বারা তদ্বৃত্তান্ত বিবরিত হওয়া আবশ্যক।

যেখানে সমাগম, সেই খানেই সভা; যেখানে সভা, সেই খানে সভাপতি। কালের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বঙ্গের গণপতি এই জন সমাগমে সমাগত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। মণিমুক্তা বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত স্বীয় রাজশ্রী প্রদর্শনে, সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্বানের বল বিজ্ঞান; সুতরাং রসায়ন রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেবভাষা, নাগরবেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন

করিয়া লম্বশাটপটাবরণে সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শীতল ভাবে মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন ; কল্পনা সঙ্গে কাহিনী সেখানে মৃদু মন্দ হাসিতেছিলেন। পাছে এত শোভা সমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেই জন্য নেত্র রোগ-ধন্বন্তরীও নিজ বিপুল কলেবর সঞ্চালনে ক্রটি করেন নাই।

এতদ্ভিন্ন বিভাকরাদি নানা গ্রহ, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ উপগ্রহ, কুলাচার্য্য ডার্বিনের পরম পূজ্য স্বকৃত ভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে উপেক্ষা করেন নাই। আর যেখানে এত উপসর্গ, সেখানে সাধারণীর অক্ষয়চ্ছায়া, মুল স্বর্গের অপ্সরা-স্থানীয় হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবার কথা? এমত অবস্থায়, সুকণ্ঠ সঙ্গীত এবং আকণ্ঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরানন্দের বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, আইস ভাই, প্রবন্ধ শেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কাপি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

—০—

সৎ পরামর্শ।

ফাঁসি দিবার জন্য বৃন্দাবনকে মশানে লইয়া যাইতেছে। আর, ফাঁসি দেখিবার জন্য দলে দলে লোক দৌড়িতেছে। একদল লোককে ডাকিয়া বৃন্দাবন বলিল—"ভাই সকল, কেন ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছ? আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত কোনও কাজই ত হইবে না"।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত।

শিক্ষক। তাপের গুণ এই যে, তাহাতে পদার্থের সম্প্রসারণ হয়, অর্থৎ পদার্থের আয়তন বাড়ে। শৈত্যের গুণ ইহার বিপরীত, শীতে পদার্থ সঙ্কুচিত অর্থাৎ ছোট হইয়া যায়।—বুঝিতে পারিলে ত?

ছাত্র। আজ্ঞে, বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দাও দেখি?

ছাত্র। এই যেমন—দিন। গ্রীষ্ম কালে বাড়ে, আর শীত কালে ছোট হয়।

বিলাতের

সংবাদদাতার পত্র।

আমার প্রিয় পঞ্চানন্দ,

আমি এখন সভ্যতার খনিতে প্রবেশ করিয়াছি, সুতরাং আর সে সেকেলে—"দণ্ডবৎ প্রণামা" ইত্যাদি বর্ব্বর সম্বোধনে আমার পত্র কলঙ্কিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের লোকের একটা ভয়ানক কুসংস্কার আছে; তাহারা মনে করে যে পিতা বা তত্তুল্য লোক হইলেই ভক্তির পাত্র হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সরস প্রিয় সম্বোধন করিলে পাপ হয়! কি মূর্খতা! ফলে, এখানে কোনও প্রকার কুসংস্কারের স্থান পাইবার অধিকার নাই; এক জন নেটিব কবি লিখিয়াছেন—

"বিলাতের মাগী ঠেকে যদি পায়ে,
দাসের শিকল খসিয়া যায়;
বিলাতের হাওয়া লাগে যদি গায়ে,
পরবশভাব বিনাশ পায়।"

(আমার অনুবাদের দোষ ক্ষমা করিবেন; আমি যে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার 'পরবশ' হইয়া রহিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট।)—কাজে কাজেই আমি এখানে আসিবার সময়ে ভারতের কুসংস্কার, ভারতের কুব্যবহার, ভারতের কুপরিচ্ছদ—সমস্তই বৃটিশ চ্যানেল, অর্থাৎ ডোবরের দক্ষিণবর্ত্তী খালে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিক, আমার স্মরণ হইতেছে যে আমাদের দেশের অনেক লোক শুদ্ধ বিলাতের গন্ধ বলে এ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে; এখন মেষ্টর বাবু অবধি নিরেট ন্যায়বাগীশ পর্য্যন্ত অনেকে সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে আমি যে "কালাপানী" পার হইয়া, লালপানী উদরে ধরিয়াও বেআদব চটী এবং বেয়াদব টিকীর ভয়ে সেই বকেয়া বাপ পিতামহের বোকামি বহিয়া মরিব, ইহা কখনই সম্ভব না। আপনি যদিও আমার শিক্ষাগুরু, তথাপি বিনয়ের সহিত আপনাকে শিখাইতে ইচ্ছা করি যে আপনি যত সত্বর আপনার সেই হাস্যজনক হাব ভাব এবং ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করেন, ততই মঙ্গল। যে গোরু আমাদের সেবায় লাগে, আপনারা সেই গোরুর সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন,—এ লজ্জাকর কথা যেন আমাকে আর না শুনিতে হয়। যাহা হউক, এইবার অপ্রাসঙ্গিক প্রলাপ ছাড়িয়া আসল কথায় প্রবেশ করা যাইতেছে।

আমার শেষ পত্রে আভাস দিয়াছিলাম যে এখানে থাকিয়া হয় ত নেটিবদিগকে আমি ভালো বাসিয়া ফেলিব। এখন সত্য সত্যই তাহা ঘটিয়াছে এবং উপরের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া আপনি তাহা বুঝিতেও পারিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক এখানকার কয়েক জন নেটিবের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি এ দেশের গুণে মোহিত হইয়া উঠিয়াছি।

নেটিবদের প্রধান গুণ এই যে, যখনি

কাহাকে বলে, ইহারা জানে না। আমাদের দেশের লোকে সংসারকে ভবের হাট বলে, অথচ হট্টগোল ভিন্ন হাটের কোনও পরিচয় তাহাদের কাছে পাওয়া যায় না। নেটিবদের ভাব অন্যরূপ; ইহারা মুখে বলে না, কিন্তু কাজে দেখায় যে সংসার ভবের হাটই বটে। খরিদ বিক্রী, লেনা দেনা ভিন্ন এখানে আর কোনও কথা নাই।

"ভারতবর্ষের সঙ্গে এ দেশের কি সম্বন্ধ? অনেকগুলি নেটিব ভদ্রলোককে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাহারা সকলেই আমার প্রশ্নে অবাক্ হইয়া ঈষৎ হাসিয়া, মধুর ভাবে আমাকে উত্তর দিয়াছে—" গুরুর দিব্য!—(ইংরেজীতে "বাই জোব," কি না, 'বাই জুপিটর' কি না বৃহস্পতির দিব্য,—সুতরাং আমাদের দেশীয় ভাষায়, গুরুর দিব্য!) —তুমি পঞ্চানন্দের আত্মীয় (ইংরেজী শব্দ—ওন্) হইয়াও একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না! কেন, এক জন দুগ্ধপোষ্য শিশুও তোমাকে বলিয়া দিতে পারে যে ভারতবর্ষের সহিত এ দেশের 'খাদ্য খাদক' সম্বন্ধ। যদি সে সম্বন্ধই না হইবে, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক উন্নতির জন্য আমরা এত ব্যস্ত থাকিব কেন?" উত্তরের শেষ ভাগটা শুনিয়া আমি অধিকতর কুজ্ঝটিগ্রস্ত হইলাম দেখিয়া নেটিবেরা হাসিতে হাসিতে আমাকে বুঝাইয়া দিল—" আমরা মেষ ভক্ষণ করি, তাহা ত জানো। বেস, কিন্তু তাই বলিয়া কি দুর্ব্বল, মাংসহীন, বসাহীন মেষ আহার করি? না। মেষকে ভক্ষণ করিবার অগ্রে অন্ততঃ ছয় মাস ছোলা খাওয়াই, মেষকে হৃষ্ট পুষ্ট করি—তাহার পর উচিত ব্যবস্থা করি। ভারতবর্ষের উন্নতি না করিলে আমাদেরই ক্ষতি, আমাদেরই অসুখ, ইহা কি তোমরা বাস্তবিক বুঝিতে পারো না?" এই ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে. নেটিবদের সঙ্গে ভালোবাসা ত হইয়াছেই, অধিকন্তু তাহাদের উপর আমার অচলা ভক্তি হইয়াছে। যথার্থ বলিতেছি, এমন ক্ষতি লাভজ্ঞ, সুবিজ্ঞ, পরিণামদর্শী মনুষ্য সংসারে আর কোথাও আছে বলিয়া আমার আর প্রত্যয় হয় না।

ভারত-রাজ্য চালাইবার জন্য নেটিবেরা যে বন্দোবস্ত করিয়াছে, দেশে থাকিয়া সেটা ভালো বুঝিতে পারিতাম না, আর দেশের অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারে না। কাজেই এত অসন্তোষ, আন্দোলন এবং গণ্ডগোল সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আসিয়া উত্তমরূপে ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছি এবং বুঝিয়া প্রেম রসে অভিষিক্ত হইয়া আমি এখন কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই অনুরোধ করিতেছি যে কোনও কথায় যদি ছিট দেখিতে পান, কিছু

মনে করিবেন না। ঠাকুর মা বলিতেন এক দেশে এক মালিনী ছিল, সে রাজপুত্রগণকে গাঁড়ল করিয়া রাখিয়া দিত। এখন আমার মনে হইতেছে যে এই সেই মালিনীর দেশ; নহিলে যে একবার এখানে আসে, সেই গাঁড়ল হইয়া যায় কেন?

যাউক। বন্দোবস্তের কথা বলিতেছিলাম। হিন্দুর ভারত না কি খুব পুরাতন, খুব ভাক্তর সামগ্রী; তাই জানিয়া ভারতবাসীকে তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে ভারত-লক্ষ্মী কার্য্যক্ষেত্রে মেটিবগণ ভারতের প্রাচীন আচরণ বিচরণে জোর জবরদস্তি করিয়া কোনও গোলযোগ করিয়া দেন নাই। ভারতবাসী জানে যে সসাগরা পৃথ্বীর রাজা না হইলে রাজাই নয়; তাই ইন্দ্রদেবী সাগরের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া ভারতের ভূসম্পত্তির উপর অধিকার চালনা করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের সংযোগ ভিন্ন সংসার চলে না, ভারতবাসীর এই চিরন্তনের বিশ্বাস। এ দেশের সাহিত সম্বন্ধ হইলেও সে বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

এই দেখুন যাহারা সিবিলিয়ান নামে পরিচিত, তাঁহারাই হইতেছেন ব্রাহ্মণ,—বেদ বিধির কর্ত্তা, মঙ্গলের পূজা, বঙ্গের বন্দিপাত্ত পর্য্যন্ত বিরাজমান; আর সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ ইহাঁদের উপনয়ন, কবেনাণ্ট ইহাঁদের উপবীত, অতএব ইহাঁরা দ্বিজ পকবাচা। ইহারা স্বয়ং অবধ্য হইয়া যাহাকে যে নরকে নিক্ষেপ করা আবশ্যক, করিতে সম্পূর্ণ অধিকার বিশিষ্ট, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের একমাত্র প্রযোজক এবং ক্ষণস্থায়ী অসার সংসারে দেবতা ব্রাহ্মণের উপাসনা এবং তাঁহাদের উদ্দেশে স্বার্থের উৎসর্গ করিলেই অর্থের সার্থকতা—এই পরম জ্ঞানের নিত্য উপদেষ্টা। ব্রাহ্মণের উপবীত সংস্কার অল্প বয়সেই কর্ত্তব্য; এই জন্য সিবিলিয়ানও অল্প বয়সেই হইতে হয়; পাছে ইহাঁরা ভারতবর্ষে এ দেশের ব্যবস্থার আরোপ করিয়া অনিষ্ট করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় ইহাঁদিগকে এ দেশে কিছু শিখিতে দেওয়া হয় না; সুতরাং অপক্ষপাতে, অবিচলিত চিত্তে, শুদ্ধান্তঃকরণে ইহাঁরা তথায় কাজ করিতে পারেন।

এই রূপ মিলিটারি অর্থাৎ সৈনিকরূপে ক্ষত্রিয়, মার্চান্ট অর্থাৎ বণিক রূপে বৈশ্য হইয়া ভারতের লালন পালন, ধর্ম্ম রক্ষা, শাস্ত্র দীক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার নটিভেরা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শূদ্র অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকে যে মনে করে, নানা ছেকে ভিক্ষা করাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য, সেটা নিতান্ত ভুল। সহজে বুঝিলেই ত হয় যে এক মাত্র বশ্য বৃত্তিতে যাহা সাধ্য, তাহার জন্য এত গুলি ভিন্ন বৃত্তি কে কোথায় অবলম্বন করিয়া থাকে?

ভারতবর্ষ হাট বলিয়াছি, সে কথার মাহাত্ম্যও

ইহারা যথাবিধি রক্ষা করিয়া থাকেন। সকলেই ত বে। কেনার ব্যাপার লইয়া আছে; তাহার মধ্যে আবার সূতার ব্যাপারীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে। যে সংসারে সকলেই কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা, সেখানে সূতার মান বাড়াইবার চেষ্টা করাই সুবোধের কাজ। তাই এখানে ম্যানচেষ্টারের মান রক্ষার এত চেষ্টা। ভারতবাসী না কি ব্যাপার বোঝে না, কেবল গোল করিতেই মজবুত, তাই ভক্তি কাণ্ডের সূত্রপাত লইয়াই এত বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বাস্তবিক ম্যানচেষ্টারের তাঁতিকুলের মান না রাখিলে এখানে কাহারই কুল রক্ষার আশা থাকে না।

এখানকার রাজকার্য্য মহাসভার দ্বারা সম্পন্ন হয়; ভারতে যেমন মহালাট, অমুলাট প্রভৃতি বিরাট পুরুষেরা সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করেন, এখানে সে রূপ কেহ নাই। এমন কি স্বয়ং সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীকেও এখন সাক্ষী গোপাল হইয়া থাকিতে হয়। গৃহস্থের ইচ্ছা মত ভোগরাগে যেমন কুলবিগ্রহকে তুষ্ট থাকিতেই হইবে, এখানকার সভার কার্য্যে রাজাকে বা রাণীকেও সেই রূপ অনুমোদন করিতেই হইবে। এ দেশ টা বাস্তবিক অদ্ভুত দেশ, এখানে নামে রাজা আছে অথচ কাজে রাজা নাই। তাই বলিয়া দেশটা যে অরাজক তাহাও নহে। সেই জন্যই ত অদ্ভুত বলিতেছি

সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় বলিয়াছি। এই সভায় দুই দল লোক থাকে, এক দল কর্ত্তৃত্ব করে, অন্য দল সেই কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইবার জন্য নিয়ত বিরোধ করিতে থাকে। মজা এই যে কর্ত্তৃত্ব যখন যে দলের হাত ছাড়া হয়, তাহারাই রাজ্যের পরম বন্ধু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মনে করুন, এখন পাতির দল কর্ত্তা আছে, গোঁড়ার দল এখন বলিয়া বেড়াইতেছে, " ঐ দেখ, দেশের সর্ব্বনাশ করিল, মান সম্ভ্রম সব গেল, লোকের টাকা গুলা খোলাম কুচির মত উড়াইয়া দিল; আমরা থাকিলে কিছুতেই এমন হইত না "। কিন্তু এ দেশের লোকে বেস বুঝিতে পারে যে দুই দলেরই মুখ-ভারতী বিলক্ষণ, কাজের রীতিতে সে লক্ষণ বড় একটা থাকে না। সুতরাং রাজ্যটা খেয়ালের উপরেই চলে। নেটিবদের এই একটা আমোদ।

সভার দুই দলেই খুব আমুদে লোক আছে; হাতে কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, ইহারা ভারতবর্ষের কথা তুলিয়াও কত আমোদ করে। কেহ ভারতবাসীকে ইন্দ্রত্ব দিতে চায়, কেহ ভারতবর্ষকে নন্দন কানন করিতে ইচ্ছা করে, এই রূপ কত খেয়ালই তোলে। কিন্তু কাজের ভার পড়িলে ইহারা গম্ভীর হয়, তখন আর সে বৃথা আমোদের কথা লইয়া সময় নষ্ট করে না। এটা খুব গুণ বলিতে হইবে, কাজের সময়ে কাজ, আর আমোদের সময়ে আমোদ করাই ত মনুষ্যত্ব। নহিলে বসে বসে হাসিতে হাসিতে আমরা যত কথা বলি, সে সকল যদি কাজের বেলায় চলিতে হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে?

পঞ্চা-নন্দ

দ্বিতীয় কাণ্ড]　　সন ১২৮৭ সাল।　　[২য় খণ্ড।

গোরাচাঁদ।

(ঐতিহাসিক নবাখ্যান)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা।

নব বিধানের রহস্য ভেদ শুনিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত; রাজকুমার আলবার্টের মধ্যম পৌত্রের প্রপিতামহী জন্মভূমি হইতে অমূর্ত্তার্য্যনামা বস্তুসত্ত আনাইয়া জীবতত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেছেন দেখিয়া, বিরাট-লাট-রাজপ্রতিনিধি পুণ্যভূমি আর্য্যভূমিতে একটী কাবুলী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুচারুরূপে তাহার সেবা পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; এবং এবম্বিধ বহুবিধ ঐতিহাসিক ব্যাপার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নৈসর্গিক নিয়মাবলীর অবিকলতা প্রতিপন্ন করিতেছে; এমন সময়ে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শত একাশীতিতম অব্দের প্রথম এপরিল দিবসে বেলা ছয়টার পর গোরাচাঁদের বাড়ীতে ভরপুর মজলিশ জমিয়া গেল।

কোমলপ্রাণ পাঠক! বীরপ্রসবিনী পাঠিকে! প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণটা একটু কঠিন হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। যখন বিদ্যার বেগ সম্বরণ করা যায় না, তখনই লেখকেরা গ্রন্থারম্ভ করে, সুতরাং ভাষার জোয়ারের মুখে জঞ্জাল দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি পাঠক মহাশয়ের স্বজাতি-বাৎসল্যের—পাঠিকা ঠাকুরাণীর গুরুজন-ভক্তির—দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহার পর যাহা লিখিব অতি প্রাঞ্জল নির্ম্মল ভাষাতেই লিখিব। দন্তহীন ব্যক্তির স্বাদ বোধ অল্প; সেই জন্য গোড়াতে এক মুঠা এক মুঠা চাল

ভাঙ্গা চোলা ভাঙ্গা দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিলাম। আমি দরিদ্র,—আত্তা, রাকাবি কোথায় পাইব? যদি অঙ্কুরেই অপ্রীতি না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার এ ভুনির দোকানে যাহা কিছু আছে সকলই দেখাইব।

বাগবাজারের ঘোষ পাড়ার একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যদেব অন্যকার মত রাত্রি বাসের জায়গা খুজিতেছিলেন; একটা প্রকাণ্ড নারিকেল গাছের পশ্চিম দিকের পাতা গুলা তাই দেখিয়া হাসিতেছিল; পূর্ব্বদিকের পাতা গুলার স্বভাব কিছু নম্র, আস্তে আস্তে অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া ম্লান মুখে তাহাদিগকে হাঁসিতে বারণ করিতেছিল। ইত্যাদি। এ সমস্ত কবি কল্পনা; লেখকের বর্ণন শক্তির পরিচয় মাত্র। প্রকৃত কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

যেখানে সেই নারিকেল গাছ, তাহার উত্তরদিকে ইটের প্রাচীর, তাহার উত্তরেই গলি; তাহার পরেই দরজা দিয়া উত্তর মুখে প্রবেশ করিলেই গোরাচাঁদের বাড়ী। বাড়ীর বর্ণন করিয়া আর কষ্ট দিব না, ফলে বাড়ী খানা জুমহল। নির্ভয় চিত্তে, আমার সঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্বদ্বারী একতলা ঘরের বারাণ্ডায় পাড়ার মহিলাদের ভরপূর মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। উপরে এই মজলিশের কথা বলিতে গিয়াই বর্ণন কণ্ডয়নে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামী, বামী শামী, অলকা, তিলকা, মেনকা, বিমলমণি, কমলমণি, সূর্য্যমণি, হেবোর মা, পুঁটীর মা, খোকার মা প্রভৃতি ছোট বড় মাঝারি বয়সের বিস্তর মহিলা সেই মজলিশে উপস্থিত। কেহ গা আদুড় করিয়া, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ আর ঘোমটা টানিয়া,—নানা ভাবে নানা মহিলা বসিয়া আছেন। আর, কেহ বা দুয়ারের শিকলি ধরিয়া, কেহ বা এক পায়ে ভর দেয়ালে ঠেসান দিয়া, কেহ বা আঁচলের খুটে-বাঁধা চাবির রিঙ আঙ্গুলে ঘুরাইয়া অন্যমনস্কা হইয়া,—কত জন কত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন; কেহ বাসরের গান ভাবিতেছেন; কেহ নূতন অপেরার নূতন টপ্পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন; কেহ, অপরের নূতন ধরণের কেশ বিন্যাস প্রণালীটা মৌনভাবে সমালোচন করিতেছেন; কেহ বা গোরাচাঁদের বনিতাকে সাহস দিতেছেন, কেহ বা কল্পিত বহুদর্শিতার সুপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা, নানা রকমে নানা জনে কথা কহিতেছেন; হাসির উপদ্রবে, নিষেধের তাড়নায়, পরামর্শের গভীরতায়, রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নি[illegible] অগ্রাহ্য[illegible] এমন তর একটা গোলযোগ-[illegible] হইতেছে। মজলিশের উপস্থিত [illegible] চাঁদের বনিতা আসন্নপ্রসবা। [illegible]

যশোর জেলায় পূর্ব্ব প্রান্তে [illegible] এক পল্লী গ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার মাতার

বাড়ী; নাম, বসুমতী। নামটা উনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া গোরাচাঁদ স্বয় উত্তমার্দ্ধকে বিকল্পে বসন, বসনী, বা বসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন; প্রাণান্তেও বসুমতী বলিতেন না। আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেই নাম করিয়া গোরাচাঁদ-গৃহিণীর পরিচয় দিব।

বসুমতীর বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, বর্ণ গৌর, এমন কি চুলগুলি পর্য্যন্ত খুব কালো নয়; গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সংপ্রতি কেমনা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোট; চক্ষু দুটী ডাগর, কিন্তু কোণে বসা; নাক সুদীর্ঘ, টিকলো, সরু; গাল দুখানি মরা মরা, উপর ঠোঁট খুব পাৎলা, নীচের খানি পুরু, থুতনী খুব অল্প। বসুমতীর সুর চড়া, কিন্তু মিহি; অল্পেই নাকীতে ওঠে। এ হেন বসুমতী আসন্নপ্রসবা, সেই মজলিশে বসিয়া আছেন, কদাচ দুই একটা কথা কহিতেছেন, কিন্তু এত গোলে তাঁহার কথা ধরা যাইতেছে না। যাহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট; সুতরাং বসুমতীর কথা না বুঝিলেও তাহাদের কোনও ক্ষতি হইতেছে না।

গোরাচাঁদ বাড়ীতে ছিলেন না। স্ত্রী-উদ্বোধনী সভায় আজ বিশেষ অধিবেশন; সুতরাং সভাপতি গোরাচাঁদ বেলা একটার সময়ে সেই স্থানে গিয়াছিলেন। স্ত্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়ীতে এ মজলিশ বসিবে তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড় ভয় করিত, আজি বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া মেয়েরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া জুটিয়াছিল। এমত অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যখন বাড়ী আসিলেন, তখন মজলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরাচাঁদের পরিচয় দিবার এই সুযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া যাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা গুণ এই যে ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও, খোসা যে সবুজ সেই সবুজই রহিয়া যায়। বয়সের হিসাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম; পঁচিশের উপর পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সকল বয়সই গোরাচাঁদের হইতে পারিত, কেবল এক বুড়ী মা বাড়ীতে থাকাতেই গোরাচাঁদের বয়স চল্লিশের নীচে রাখিতে পাড়া প্রতিবাসী বাধ্য হইয়াছিল। অবচূর্ণালকশ্রাম:— (ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ খর্ব্বাকৃতি, প্রশস্ত চতুষ্কোণ ললাট, স্থূল নাস, প্রবল হনুমত্ত, বর্ত্তুলাক্ষ, গুম্ফবিভীষিত নিষ্পিষ্ট ওষ্ঠাধর, বিরল অথচ দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিত চিবুক, মস্তক

ধূসর কাশ্মীরার ক্যাপ, গলায় তুলোর গলবন্ধ কম্ফর্টার, আধ-চীনে-আধবিলাতী কালো আলপাকার কোট এবং সাদা জিন কাপড়ের পেণ্টুলন-পরা, হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ডবল স্প্রিং জুতা——পুষ্ট না হইলেও তুষ্ট গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার হৃদয়াকাশের চাঁদ (বসুমতী) কাতর মুখে, কাতর ভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে নিজ দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিস্মিত না হইয়া, গৃহিণীকে কিছু না বলিয়া এবং কোনও জিজ্ঞাসাও না করিয়া গোরাচাঁদ নিকটবর্ত্তী হইয়া বসুমতীর হাত ধরিলেন এবং শুষ্ক হস্ত বলের অনুরোধে তাঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বসুমতী মুখ তুলিয়া চাহিল কিন্তু কথা কহিল না।

গোরাচাঁদের মা রান্না ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়া গোরাচাঁদ বিরক্ত হইলেন। বসুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বাম হস্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা হইয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলিলেন——

"শাবাশ! তোমার রান্না হয়েছে?—কর্ত্তব্য পালন আগে; বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর! রুটী হয়েছে?—হয় নাই; ডা'ল হয়েছে?—হয় নাই; চচ্চড়ি হয়েছে?—হয় নাই; মাছ ভাজা হয়েছে?—হয় নাই!——আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, আমার কাছে আমোদ কর্‌তে এলে! ছি! ছি!" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্য্যন্ত; আপনার আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন——"মা মনে করে, যে মা হ'লেই বুঝি সাত খুন মাফ! এই এলুম একটা কাজ করে'; কোথায় দুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে মন তুষ্ট কর্‌ব, পরিশ্রমের অবসাদ বিনাশ কর্‌ব, মা বুড়ী এসে সুমুখে দাঁড়ালেন! এদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই?

মা থতমত, ভীত, সঙ্কুচিত! বলিলেন—"না বাবা; এই বৌমার অসুখ করেছে, তাই বল্‌তে এলুম, বলি যদি কারুকে ডাক্‌তে টাক্‌তে হয়, তা হ'লে————"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা। তা হ'লে আমার কি?——যাও, যাও, বিরক্ত ক'রো না।"

"আহা! পরের জন্য বাছার আমার আহার নিদ্রে নাই। খেটে খুটে এসেছে——!" ফিড়িক করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্ত্তব্য পালনের [illegible] আপনার [illegible] করিলেন।

তখন গোরাচাঁদ আবার পূর্ব্ব ভাব

অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া, একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন——"অসুখ হয়েছে? কি অসুখ, বসন? তোমার অসুখ করেছে? তোমার?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন; খাটের উপর বসনকে সবলে উপবেশন করাইলেন।

বসুমতীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; নয়ন নদের পঙ্কিল জলে কপোল-ভূমি ভাসিয়া গেল।—"তোমার বসীর কি হয়েছে, তা' কি তুমি জানো না?" স্বল্পভাষিণী বসুমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশ্বাস, অথবা কণ্ঠরোধ সূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে এই কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল। গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতেছিলেন; খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

আমি ত জানি না যে তোমার কোনও অসুখ করেছে। তোমার অসুখ জানলে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক? তোমার জন্যে আমি নদীর জল, গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র তন্ন তন্ন করে' তোলপাড় কর্‌তে পারি, স্বর্গমর্ত্ত আন্দোলিত কর্‌তে পারি——আর, আমার সেই বসনের, আমার হৃদয়ের সেই বসীর, আমার সেই তোমার অসুখ জেনেও আমি হিমাচলের মত শীতল, অচল ভাবে বসে' থাক্‌ব, এও তোমার বিশ্বাস হয়?"

বসুমতী দেখিলেন বেগতিক; এখন যে এই প্রণয়সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি সুখানুভব করিবেন, এমন অবস্থা তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্যাড়ম্বরের দিকে না গিয়া সাদা কথায় বলিয়া উঠিলেন——"আজ বুঝি আমার ছেলে হ'বে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ। "এই বুঝি অসুখ?"

বসুমতী। "দত্তদের বাড়ীর মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার আরও ভয় হচ্ছে। ওমা! তা হ'লে আমি কি কর্‌ব?"

বসুমতী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তদের বাড়ীর মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কি না; বসুমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কি না; যে জন্য, যে স্ত্রী পুরুষের সাম্য সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রত সার্থক করিবার এই সুযোগে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না——এই মানসিক বিতণ্ডায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল

পরে, শেষ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্ল ভাবে, হাসি হাসি মুখে বলিলেন——

"বেস্ হয়েছে! তোমার এই যে অসুখের কথা বল'ছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমার কষ্ট পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রসব কর্‌ব; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে' খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোও গে। আমি রইলুম, ছেলে প্রসবের ভারও আমার রইল।"

বসুমতী অবাক্!

"সে কি? তুমি প্রসব কর্‌বে কি?——তা' যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা কি বলো?" অনেক কষ্টের উপরেও একটু হাসিয়া, বসুমতী এই কথা করটী বলিল।

"তা যদি হ'ত?—কেন? যদি কেন? তা' হ'তেই হ'বে। তুমি যেটা অসম্ভব মনে কর্‌ছ, সেটা আমার মতে একটুকুও অসম্ভব নয়।—হাঁ আমি স্বীকার করি, যে এ পর্য্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতির বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কু অভ্যাস। আগে রেলের গাড়ী ছিল না, তাই বলে' কি রেলের গাড়ী হ'ল না? আগে কেবল পুরুষেই বই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাড়া কর্‌ত—এখন কি তা উল্‌টে যায় নি? কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কু সংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়্‌তে হয়, বাগবাজার ছাড়তে হয়——সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্ছি না। আমি ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ী কর্‌ব, সেখানে নিজে প্রসব কর্‌ব—তবু তোমাকে আর কষ্ট সহ্য করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিকে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।"

বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাচাঁদ প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের ভাব দর্শনে গোরাচাঁদের মা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁহার হাতের এক ধোঁছা রুটী উননে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাড়ার লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলস্থুল ব্যাপার, কিন্তু গোরাচাঁদের বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। বাস্তবিক সদ্‌-বক্তার, সুকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই গুণই এই; ইহাঁরা তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভা কি? অসাধারণতা কোথায়?

অনেক ক্ষণ পরে গোরাচাঁদের চটকা ভাঙ্গিল; তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে; বুঝিতে পারিলেন যে আপনি বক্তৃতা করিতেছেন; আর কথাটা না কি নিজ গৌরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া গোরাচাঁদ বুঝিতে পারিলেন, যে শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্রজালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোক সমবেত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সিদ্ধ

বক্তা;—জনতাই তাঁহার ঘর বাড়ী, জনতাই তাঁহার অস্থি মাংস; মৎস্যের যেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাচাঁদের তদ্রূপ; সুতরাং গোরাচাঁদ বিস্মিত হইলেন না, সস্মিত বদনে হতবুদ্ধি জননীকে বলিলেন—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি।" বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোক সমুদ্রে নয়ন সঞ্চালন পূর্ব্বক দেখিলেন, সংবাদপত্রের লেখক তাহাতে ভাসিতেছে কি না। দেখিলেন, কিন্তু বৃথা! যে হেতু, সংবাদপত্রের স্বসম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসারের দোষই এই; শিয়রে সময় মত ইতিবেত্তা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোণার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইয়া যায়!

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে বৌমা বিছানায় পড়িয়া ছটপট করিতেছেন এবং কাতর ভাবে—"মাগো মরচি গো, আর বাচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। সুতরাং জলের কথা ভুলিয়া গিয়া বৌমার শুশ্রূষা করিতে বসিয়া গেলেন। অভ্যাস দোষেই হউক, কুলধর্ম্মের গুণেই হউক, বসুমতী যে তখন বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতেছিল, তাহার আর কথাটী নাই; এবং গোরাচাঁদের মা যে সে কষ্ট বুঝিতেছিলেন, তাহারও সংশয় নাই। সুতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাসার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

জল আসিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের দুইটা প্রধান অঙ্গ—সংবাদপত্রের লিপিকর এবং জলের গেলাস—অনুপস্থিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলা মণ্ডলীর উপর গোরাচাঁদ কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু! আপনি ভালো হবি না, পরকেও হ'তে দিবি না।—তোরা আপনার নাক কাটিস, কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সৎকার্য্যে যোগ দান,—আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ—দূরে থাক্, বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ করে' আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাসা দেখতে এয়েছেন,—আমার——চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ দেখতে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ী থেকে! বেরো, বলুম বেরো! এক্ষণি বেরো! নইলে এক এক কিলে তোদের নাক ভেঙে থেঁতো করে' দেবো, জানিস নে?"

স্ত্রীলোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত; তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে

প্রবেশ করিয়া, জননীর উপস্থিতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, —"বসন। এই তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা কর'ছি তুমি আমাকে. প্রসব কর'তে দিবে কি না?"

"বসন" নিরুত্তর। পূর্ব্ববৎ এ পাশ ও পাশ, হা হতাশ করিতে লাগিলেন।

"বাবা গোরাচাঁদ——" বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীব্র দৃষ্টির পর এক লম্ফ প্রদানে গোরাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নর-টার সময়ে স্ত্রীর ছুরভিষন্ধির প্রতিবিধান কল্পে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংকল্প করিয়া চলিলেন যে স্ত্রী পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবশ্যক মত বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভার এই রূপ অবধারণ করিয়া, সভার কার্য্য বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ করাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

—ঃ—

আশার অতিরিক্ত।

পিতা। (পুত্রকে) কেমন, আজ তোমাদের স্কুলে ওঠাউঠি হ'ল; না? তোমাদের ক্লাসের ক জন উঠ্‌ল? তুমি উঠেছ তো?

পুত্র। (সহর্ষে). আজ্‌কে কারুই উঠ্‌তে বাকি নেই, স্কুল সুদ্ধ উঠে গ্যাছে; আর পড়া করতে হ'বে না।

দিশাহারা।

"তুমি কার, কে তোমার,
কারে বলো রে আপন?"

নববিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। "সাধারণী" একবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল

"আমি তার, সে আমার
তারে বলিরে আপন।"

সর্ব্বনামে "সাধারণীর" সন্তোষ হয়; পঞ্চানন্দের হইবে কেন? তাই এ কথাটা আবার তোলা গেল।

তুমি গড়িয়াছ গির্জ্জা, নাম রাখিয়াছ মন্দির, দাঁড়াও পুল্‌পিটে, বলিয়া থাকো সেটা বেদি; যীশুখৃষ্টের নাম গাইয়া তুমি পাদরি ভুলাইয়াছ; হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াছ; খোল করতাল, ডোর কৌপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধূলি দিয়াছ; আবার শঙ্খ ঘণ্টা হুলুধ্বনি দিয়া নববিধানের ধ্বজ-দণ্ডের বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু কুল-

বধূর মন মোহিত করিয়াছ। বাবাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার, আর তোমারই বা কে ?

তোমার চক্ষে সোণার চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া; পদ্মকুটীর-অট্টালিকায় বাস করিয়া তুমি সন্ন্যাসী; স্ত্রী-পরিবারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তুমি বৈরাগী; কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া তুমি যোগ সাধনে নিমগ্ন; রেলের গাড়ীর গদী-মোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া তুমি দারিদ্র্য ব্রতাবলম্বী;——বাবাজী, সত্য বলিতেছি, তোমাকে চিনিতে পারিলাম না, সেই জন্য সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "তুমি কার, কে তোমার ?"

সামাজিক নিয়ম সমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই জন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল আপনার মেয়েকে রাজ-রাণী করিয়া দিলে ? সেই জন্যই কি হিন্দুর ছত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল, আর ঝগড়া করিয়া আরও একটা ভাঙ্গা দল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আটি করিয়া দিলে ? বলো দেখি বাবাজী, তুমি বাস্তবিক কোন্ দলের, আর তোমার আসল মত খানাই বা কি ?

তুমি পৌত্তলিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না; অথচ তোমার মন্ত্র তন্ত্র আছে, তাহাতে বাবা ভগবান, মা ভগবান পৃথক পৃথক আছে; ভগ-বানের পদ্ম আঁখি, রাঙা চরণআছে। তুমি মুসলমান, তাহাও বলিবার যো নাই, তবু মক্কা মদিনায় মহম্মদের কাছে তোমার তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া টুকু আছে। তুমি খৃষ্টান নও, কিন্তু খৃষ্ট পুরাণের ব্রত পর্ব্বের অনুষ্ঠানে তোমার ত্রুটি দেখি না। কত বলিব ? আমি হতভম্ব হইয়াছি, তুমিই আমাকে দিশাহারা করিলে।

তোমাকে চিনিতে পারিলাম না বলিয়া আমার ভয় হইয়াছে। ভয় হইয়াছে বলিয়া একটা অনুরোধ করিতে চাই। সুলভ সমাচারে দেখিয়াছি তুমি নববিধানে "সীতা উদ্ধার" করিয়াছ, এখন অনুরোধ এই, প্রাচীন বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, নববিধানে যেন লঙ্কা কাণ্ডটা আর করিও না। কথাটা রাখিবে?

তিনি কে?

নূতন ঝী চুরি করে' দুধের শর তুলে খায়, বামুন ঠাকরুণ এই কথা গিন্নীকে বলে' দিলে গিন্নী আবার কর্ত্তাকে তাই জানালেন। কর্ত্তা বাবু বড় ধার্ম্মিক, হঠাৎ ঝীকে কিছু না বলে' এক দিন রান্না ঘরে তাকে হাতে পাতে ধরে' ফেল্লেন, ফেলে বল্লেন—"দেখ্ পাপীয়সি! তুই এই চুরি করে, শুধু যে আমার অনিষ্ট কর্ ছিস্, তা' নয়; যাঁর সম্মুখে আমিও কীটাণুকীট, এমন এক জন উপরে আছেন, তাঁর কাছেও তোর ঘোর অপরাধ হচ্ছে। তুই জানিস্, তিনি কে?"

ঝী থত মত খেয়ে বল্লে—"আজ্ঞে জানি, তিনি——মা গিন্নী।"

সরকারের ব্যয় সংক্ষেপ।

মহকুমার ডিপুটী মেজেষ্টরের নাজির সরকারি লেফাফা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন, গালাবাতি ফুরাইয়াছে। এক পয়সার গালাবাতি বাজার থেকে কিনে আনিবার জন্য ডিপুটী বাবুর অনুমতি চাহিলেন।

ডিপুটী বাবু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; সংবৎসরের জন্য যাহা কিছু দরকার গত ১লা এপ্রেল হিসাব করিয়া আনান হইয়াছিল; অদ্য ৩০শে মার্চ্চ গালাবাতির অভাব হইল, ইহা অন্যায় কথা। ডিপুটী বাবু নাজিরের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। লেফাফা বন্ধ হইল না, পড়িয়া রহিল।

নাজিরের কৈফিয়তে প্রকাশ যে আফিশের কাগজ কলম, ছুরী কাঁচি, গালা বাতি, ফিতে কালি প্রভৃতি সরঞ্জামের বরাদ্দ কেরাণীখানা হইতে হইয়া থাকে; কমি বেশীর কথা কেরাণীখানার আমলারাই বলিতে

পারেন। নাজির যাহা পায়, তাহার হিসাব প্রস্তুত আছে, সে হিসাব সমঝাইয়া দিতে নাজিরও প্রস্তুত আছে। কৈফিয়তের উপর হুকুম হইল, হেড কেরাণী তিন দিবসের মধ্যে গালাবাতির জবাবদিহি করে। লেফাফা রওয়ানা করা বন্ধ রহিল।

হেড কেরাণীর রিপোর্ট পাঠে ডিপুটী বাবু অবগত হইলেন যে, গত বারের বরাদ্দ করিবার সময়ে যিনি কেরাণী ছিলেন, তিনি পেন্সন লইয়া বিদায় পাইয়াছেন; হাল কেরাণী বিশেষ হাল অবগত নহেন। অগত্যা ডিপুটী বাবু এক দিনের খরচের আন্দাজ গালাবাতির জন্য জেলার মেজেষ্টরের কাছে রূবকারি পাঠাইলেন। মুল লেফাফা বন্ধ করা সংপ্রতি বন্ধ রহিল।

জেলার মেজেষ্টরের সেরেস্তাদার খুব হুঁশিয়ার, পাকা আমলা। রূবকারি পোঁছিবা মাত্র, মেজেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন, গালাবাতির ইণ্ডেণ্ট ফারম্ অনুসারে হয় নাই; সাহেব ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন, এবং হুকুম দিলেন যে উচিত সংশোধন জন্য ডিপুটী বাবুর সদনে রূবকারি ওয়াপশ পাঠান যায়।

কি জন্য বেমামুলী রূবকারি দ্বারা গালাবাতির ইণ্ডেণ্ট পাঠান হইয়াছিল এবং কেনই বা ফারম মোতাবেক পাঠান হয় নাই, ডিপুটী বাবু তাহার তদন্তে লিপ্ত হইলেন। জানা গেল যে ফারমের অভাব হওয়াতে রূবকারি পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং ফারমের জন্য ইণ্ডেণ্ট গেল।

ক্রমে ফারম আসিয়া পোঁছিল, ফারম পূরণ করিয়া পুনর্ব্বার মেজেষ্টরের সদনে প্রেরণ করা হইল। মেজেষ্টর তাহা কমিশ্যনরীতে পাঠাইয়া দিলেন। কমিশ্যনর সাহেব মঞ্জুর করিয়া কাগজ কলমের সরবরাহকারী আফিশে, চালান দিলেন। বজেটের অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করাইবার জন্য একৌণ্টেণ্ট জেনেরেলের অভিপ্রায় লইয়া সরবরাহকার সাহেব যথাক্রমে, যথানিয়মে, যথাসময়ে,

পুলিন্দা করিয়া বাঙ্গী ডাকে আধ-খানা গালাবাতি কমিশ্যনরের জরিয়তে, মেজেষ্টরের মারফতে মহকুমার ডিপুটী বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

ডিপুটী বাবু দস্তর মত রসিদ পাঠাইয়া দিয়া আপন সেরেস্তায় গালাবাতি জমা করাইয়া লেফাফা বন্ধ করিবার জন্য হুকুম জারি করিলেন। সাত মাস উনিশ দিন পরে লেফাফা যথাস্থানে যথাপথে চলিয়া গেল। লেফাফার ভিতরে বাজার দরের রিপোর্ট ছিল; নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রচলিত বাজার দর ছাপা হইল।

দপ্তরি এক দিন নাজির বাবুর তামাক সাজিয়া দেয় নাই। লেফাফা বন্ধ করিবার সময়ে গালাবাতি গলিয়া তিন ফোঁটা মাটীতে পড়িয়াছিল; নাজির সেই দোষ ধরিয়া দপ্তরির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দিলেন। রিপোর্ট ক্রমে ক্রমে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হওয়াতে এক সরকুলার বাহির হইয়াছে; তাহার মর্ম্ম এই যে দপ্তরিরা গাফিলি করিয়া সরকারের যে রূপ লোকসান করে, তাহাতে দপ্তরির পদ উঠাইয়া দেওয়া উচিত, না কি দপ্তরিদের কার্য্য পরীক্ষা জন্য ষ্টেশনরি আফিশে একটা নূতন সেরেস্তা খুলিয়া সরবরাহকার সাহেবের মাসিক দুই শত টাকা বেতন বাড়াইয়া দিয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করা উচিত, প্রত্যেক জেলার এবং প্রত্যেক মহকুমার হাকিমান, এ সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ইতি মধ্যে প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় সভার কমিটি বসিয়া ফসেট সাহেবের দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপের জন্য বিলাতের মহাসভায় একটা হাঙ্গামা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

এখনও লেখা লেখি ফুরায় নাই, সুতরাং কোনও কথার মীমাংসাও হয় নাই। সেই এক পয়সার গালাবাতির গোল মিটিলে প্রেশ কমিশ্যনর আফিশ হইতে পঞ্চানন্দ অবশ্যই সংবাদ পাইবেন, এই আশ্বাসে সংপ্রতি

পাঠক বর্গকে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেওয়া গেল।

——:০:——

বিলাতী বিধবা।

বঙ্গের বিধবাকে পদ্যের কলে ফেলিয়া অনেক ব্যক্তি কবির দলে নাম লেখাইয়াছেন; কিন্তু বিলাতী বিধবা এখন পর্য্যন্ত অদলিত ক্ষেত্র, সেই জন্ম আমি একবার লেখনী ধারণ করিলাম, যশস্বী হইতে পারিব না কি?——

কবির দলের বাপ্পারাম।

[১]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
দুখিনী উহার মত দুনিয়াতে কই রে।
হারায়ে তৃতীয় পতি,
বিরহে কাতরা অতি;
পোড়া চিন্তা দিবা রাতি—
পাইব কি আর?
ললনা ছলনা বিধি, কেন বার বার।

[২]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
এক প্রাণে পতিশোক কতবার সই রে!
যেখানে চরণ চলে,
পতি আছে ক্ষিতি তলে,
বুঝি বা করম ফলে,
এই দশা হয়!
যত গোর, তত পতি, তবু পতি নয়!

[৩]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
কি হ'বে উহার দশা ভেবে সারা হই রে।
আভরণে নাই আশ,
কালির বরণ বাস,
মুখে মাখে ছাই পাঁশ,
পাউডার বলে,'
পতি সুখ, পতি শোক মিটিবে না, মলে'।

[৪]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
বিষাদে চৌচীর হিয়া যেন ভাজা খই রে!
মুখ চোক নাক কাণ,
সকলি আছে সমান;—
যায় যেন দিনমান
কিসে যায় রাতি?
পোড়ায়, পোড়ে না হায় জীবনের বাতি,।

[৫]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
তপত তেলের কড়া, তাহে যেন কই রে!

প্রাণ করে আই ঢাই,
শয়নেতে সুখ নাহি,
তন্দ্রা যদি আসে ছাই,
তাতেও স্বপন !
রমণী মরমে মরে একি জ্বালাতন !

[৬]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে !
উহু উহু মরি মরি, কাঁদিব কতই রে !
আছে দাঁড়, আছে হাল,
আছে গুণ, আছে পাল,
তবু যেন আল থাল,
মাঝির অভাবে ।
বানচাল হয়ে' কি রে ভরা ডুবে যাবে ?

[৭]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে !
নহে দুধ, নহে ক্ষীর, হায় শুধু দই রে !
বহে সদা দীর্ঘ শ্বাস,
নবেলে মেটে না আশ,
হেন ভাবে বারো মাস
কাটান কি যায় ?
নারীর জীবনে বিধি, এত কেন দায় ?

[৮]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে !
করুণ-রসেতে লেখা স্বভাবের বই রে !
সুখে, দুখে একটানা,
যা হোক করি নে মানা,
মনে তবু থাকে জানা,
ফিরিবার নয় ।
এ যে ভয়, বড় দায়, কি কখন হয় ।

[৯]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে ।
পথি পথি ভ্রমে তবু পতি না মিলই রে !
ঘোর নিশি, ঝড় বয়,
চারি দিকে চৌর ভয়
সতীপনা-মণিময়
বিধবার হিয়া,
কেহ নাই, রাখে দ্বার পাহারা বসিয়া !

[১০]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে !
ভেঙেছে আবার তার স্বরগের মই রে ।
নাই আর কারিকুরি
করিতে বয়স চুরি,
কৃতান্তের করে ধরি,
রাখি কোন্ ছলে ?
চল্লিশে চব্বিশ করা কত বার চলে ? +

+ বাঞ্ছারাম উপহার দিলেন—পঞ্চানন্দকে পঞ্চানন্দ দিচ্ছেন বঙ্গ রমণী এবং রমণী বন্ধুকে ; ভরসা যে ভক্তগণ প্রসাদে পরিতুষ্ট হইবে ।

খবর

সোমপ্রকাশ ছাপেন ঃ—

ক্লিভলাণ্ড নিবাসী ডাক্তার ব্যাণ্টনের অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি টাকা দিয়া দুইটী ভ্রাতার সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদিগের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছেদন করিতে পারিবেন এবং তৎপরে জ্যেষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া কনিষ্ঠের হস্তে এবং কনিষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে সংলগ্ন করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ অঙ্গুলি এরূপভাবে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে যে তাহারা তাহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।"

পঞ্চানন্দের মনে দুটী সংশয় হইয়াছে ; প্রথম, সোমপ্রকাশ এ পারদর্শিতা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, আর, শোনা কথা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়, ডাক্তার সাহেবের পারদর্শিতার কথা সত্য হইলেও হিন্দুর উপকার নাই ; কারণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজ হস্ত দ্বারা স্ত্রীদেহ স্পর্শ করিলে, ভ্রাতৃবধূর অঙ্গ স্পর্শ জন্য বিনা অপরাধে দাদাকে. দুবেলা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

* * *

পড়া গেল " জর্ম্মনির একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বায়ুর উপর দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

এ বায়ু কোন্ নম্বরের ? রোগ, না হাওয়া ?

* * *

"শুনা গেল গবর্ণমেণ্ট ঘোর বদমায়েস-দিগের এক একখানি প্রতিকৃতি সহর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক থানাতে রাখিতে অভিলাষ করিয়াছেন।"

বদমায়েসের অনেক লাভ ; আগে কেবল জেলখানায় খোরাক পোষাক পাইত, অথচ ঘরভাড়া, কি বাসা খরচ লাগিত না ; এখন আবার ফটোগ্রাফ তোলাইতে পাইবে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বদ-মায়েস হওয়া ভালো, দরিদ্রতার সঙ্গে সাধুতা থাকা ঘোরতর পাপের কর্ম্ম।

* * *

"২৪ পরগণার অন্তর্গত খোলাখালি নামক স্থানে কয়েকজন যুবক একত্র হইয়া একখানি প্রকাণ্ড ঘুঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া উড্ডীন করে। ত্রয়োদশ বর্ষীয় একটী বালক হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ঘুঁড়ির লাঙ্গুল ধরিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। ঘুঁড়িখানি অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে বালকটী ভীত ও স্খলিতহস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া আহত হইয়াছে। বালক এক্ষণে চিকিৎসাধীনে আছে।"

এ তো বালক ; বঙ্গদেশের বুড়োরাও বোঝে না, যে পরের লাঙ্গুল ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করাটা খুব সুবোধের কাজ নয়। তাই না হয় অমনি ধর ; তা নয়, হস্ত বিলক্ষণ তৈলাক্ত না করিয়া ধরিবে না।

* * *

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা গেল, এক ব্যক্তি "সর্ব্ব প্রকার বায়ু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ" আবিষ্কার করিয়াছেন। পঞ্চানন্দের উপদেশ মানিলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

* * *

এড্‌কেশন গেজেটে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ;—

"এক জন সুবিজ্ঞ ইংরাজিতে এণ্ট্রান্স পাস, বাঙ্গালা, পারসীতে উত্তম পারদর্শিতা ও আইন উত্তমরূপ জানা আবশ্যক, এরূপ এক জন লোকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৮ টাকা। ইহার সবিশেষ জেলা নদিয়ার মহকুমা রাণাঘাটের চাকদহ থানার অধীন কাজিপাড়া গ্রামে মুন্সী রওসন আলি সাহেবের বাটীতে আসিলে জানিতে পারিবেন। কার্য্য দেওয়ানি, সতত জমিদারি বন্দোবস্ত, মোকদ্দমা মামলাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে।"

আট টাকা মাহিয়ানাতে আপত্তি নাই ; খুঁটের পয়সা খরচ করিয়া কাজিপাড়া যাইতেও আপত্তি নাই ; কিন্তু এ কর্ম্মের যোগ্যতা বিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে কি না পঞ্চানন্দ তাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন। এড্‌কেশন গেজেটের উচিত, যেমন কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপন ছাপিয়াছেন, তেমনি কর্ম্মে ভর্ত্তির একটা বিজ্ঞাপনও তিনি বাহির করেন।

বুঝিবার ভুল।

খোলা ভাটি হওয়াতে অনেকে রাগ বিরাগ করিতেছে; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু খোলা ভাটি হওয়াটা সুলক্ষণ। এখন না কি বক্কতের দৌরাত্ম্যে ভদ্রলোকে মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই জন্য সরকার বাহাদুর সাধারণ লোকের মনে মদের উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মদ যেমন উত্তেজক, তেমনি অবসাদক; প্রথম প্রথম দিন কতক মদ মাতালের বাড়াবাড়ি হইবে বটে, কিন্তু আখেরে আর কিছুই থাকিবে না। সরকার বাহাদুর সার বুঝিয়াছেন যে মদ না খাইলে মদের দোষ জানা যায় না; দুঃখের বিষয় যে পোড়া লোকে এটা বুঝিতেছে না।

সমালোচন।

মায়া-তরু। শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলেবর ২২ পৃষ্ঠা।

এমন অদ্ভুত কাব্য-ফুল, আমরা আর দেখি নাই; মায়া-তরুর সর্ব্বাংশেই প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় আছে; কাজে কাজেই গিরীশ-চন্দ্র যে ভাবুক, রসিক, কবি, সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। তবু বলিতেছি এ ফুল নিতান্ত অদ্ভুত। শুধু বাতাসের খেলা, ফুলের হাসি, চাঁদের রূপে মানুষের প্রাণ ভরপুর সুখ পায় না; তাহাও চাই বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয়,—প্রাণ দিয়া প্রাণও পাওয়া চাই। নহিলে, মানুষ নহিলে মানুষের কুলাইবে না, প্রাণের আকুলতা মিটিবে না। ইহার বিপরীত শিক্ষা, প্রতিকূল শাসন অকর্ম্মণ্য এবং নিষ্ফল; ধরিয়া বাঁধিয়া দশ জনকে দশ দিন রাখিতে পারো, কিন্তু আখেরে প্রকৃতির জয় অনিবার্য্য। মায়াতরুর কথাই এই; আর কথা যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর ভাষাতে বলাও হইয়াছে। আক্ষেপ এই যে মায়াতরু পড়িয়া মনে একটা সুস্পষ্ট অঙ্কপাত হয় না; যেন সন্ধ্যার সময়ে সুদূরে বংশীধ্বনি হইতেছে, মিষ্ট কিন্তু অবোধগম্য; অল্প একটু উদাস জন্মাইয়া শেষে কিছুই দাঁড়ায় না, সব ভাসিয়া যায়। আরও আক্ষেপ এই যে পড়িতে ভালো লাগিল, যত ক্ষণ পড়িলাম তত ক্ষণ আগ্রহ রহিল, তথাপি পাঠ সাঙ্গ করিয়া বুঝিতে পারিলাম না মায়া-তরুর ব্যাপার বৃত্তান্ত কি? মায়াতরুর গড়ন গাঁথনির কথা লইয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিলে, ঠোঁটে ঠোঁটে যুড়িয়া থাকিতে হয়। যেমন হইয়াছে, তাহাতে মায়াতরুকে উষার স্বপ্ন বলা যাইতে পারে— স্বপ্ন মনে আছে, অথচ স্বপ্নের কিছুই মনে নাই।

ভাষা সুন্দর বলিয়াছি, আর লেখাতে ভাব রস আছে তাহাও বলিয়াছি; প্রমাণস্বরূপে মায়া তরুর একটী গান তুলিয়া দিলেই হয়;

কিন্তু এত গুলি মিষ্ট গান ইহাতে আছে, যে বাছিয়া কোন্‌টী তুলিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমাদের মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে। ১৯ পৃষ্ঠায় রাগ সকলে মিলিয়া যে গান বা কবিতা আওড়াইল, তাহাতে যেন কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া একটু চাপা ঠাট্টা আছে। সত্য সত্যই যদি ঠাট্টা করিতে ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে আর একটু ফুটিয়া বলিতে হইত। কিন্তু আমাদের সন্দেহ যদি অমূলক হয়, তাহা হইলে এ স্থানটা একেবারেই বুঝিতে পারি নাই।

———০:০———

তিল-তর্পণ নাটক। শ্লেষ কাব্য। By an Actor. ৪৩ পৃষ্ঠা।

জীতা রহো বাবা! এমন তর্পণকার বেঁচে থাকতে গ্রন্থ লেখকদের পিণ্ড লোপের আশঙ্কা নাই, বুক ঠুঁকে একথা বল্‌তে পারা যায়। তবে দুঃখ এই যে শুধু তর্পণের কোশার জল পাইয়া প্রেতপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদের পিপাসা মিটিবে না; গোড়ায় বৃষোৎসর্গ, তার পর গয়াকৃত্য না করিলে উদ্ধারটা রীতিমত হইবে না।

তর্পণকারী বড় বিনয়ী এবং নম্র; সঙ্কল্পের সময়ে নিজের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই; কেবল গোত্র পরিচয়ে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। অভিনেতৃ গোত্রে ইহাঁর ন্যায় কুলধ্বজ থাকা, শ্লাঘার বিষয়।

আজি কালি গ্রন্থকার হইবার জন্য যে প্রকার বিদ্যা থাকা আবশ্যক, আমাদের নাটককারের সে বিদ্যা যথেষ্ট আছে; নূতন পত্রিকার প্রগাঢ় সংস্কৃতে দখল, হাইলি গ্রামারের সূক্ষ্মান্তরব্যঞ্জক লাটিনে দৃষ্টি, বাঙ্গালী সরীমিয়াঁর টপ্পাগত ফারসীতে ব্যুৎপত্তি, বিদ্যাপতিলাঞ্ছন ব্রজভাষাতে অধিকার, আর রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে রাজকৃষ্ণের বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যন্ত জ্ঞান—আমাদের গ্রন্থকর্ত্তার মস্তকে সমভাবে বিরাজ করিতেছে।

যাহার বুঝিবার শক্তি আছে, সে এক আঁচড়েই বুঝিয়া লইতে পারে। তিলতর্পণের বাপ্পা রাও, আর এ হেন বাপ্পা রাওর সৃষ্টিকর্ত্তা কেমন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে কয়েক ছত্র তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে যাহার জ্ঞানোদয় না হইবে, জানিব যে তাহারই জন্য তিলতর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

"সৈন্যগণ! ভাতৃগণ! পুত্রগণ! তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছ—উত্তম করিয়াছ। এখন একবার সাহস নয়ন উন্মীলন করিয়া, তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিলোকন কর। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বোধ হয় দুর্দ্দান্ত সেরাজ উদ্দৌলার নৃশংসতার কথা অবগত আছ, পলাশির

যুদ্ধে যাহার নিধন হইয়াছে।——সেই অপগণ্ড ষণ্ডের মাতামহ যে কত পাষণ্ড-দলন তাহা তোমরা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেছ। আজি সেই মৃত সেরাজের মৃত ঠাকুরদা আলিবর্দ্দি খাঁ তোমাদের এত সাধের চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। চিতোর ধ্বংস হইলে তোমাদের কি উপায় হইবে, আর তোমরা কি রক্ষা করিবে, কিসের জন্য যুদ্ধ করিবে, তোমাদের স্ত্রী কন্যা-গণ আর কোথায় গিয়া চিতায় ঝম্প প্রদান করিবে। আর—আর, এত সকাল সকাল চিতোর গেলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবি-গণ কি লয়ে নাটক লিখিবে।"

এমন উপাদেয় কথা সত্ত্বেও এমনি ভয়ঙ্করী ঊনবিংশ শতাব্দী আবির্ভূত হইয়াছে, যে লোকে আমোদ ও পরিহাস ভিন্ন তিলতর্পণে আর কিছুই দেখিবে না।

তিলতর্পণে আমাদের একটা আপত্তি আছে। হো হো করিয়া যত খুশি হাসিয়াছি সত্য, কিন্তু হাসিবার পরেও তর্পণে কোনও প্রণালী খুঁজিয়া পাই নাই। এমন বেতালা উপহাসে লোক হাসান হয়, কিন্তু মোট ফল কিছুই পাওয়া যায় না। "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু তাহার পর সেই বিষম যোগের একটা স্থির চিত্র না দেখাইতে পারিলে, তাহার সার্থকতা রহিল কোথায়?

সবটা ধরিয়া বলিতে হইলে আমরা বলিব যে তিল তর্পণের "গ্রন্থ" সুন্দর হইলেও তিল তর্পণ "নাটক" নহে; কবিত্বের পরিচয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও ইহা "কাব্য" নহে। আর গ্রন্থন কৌশল নাই বলিয়া তিল তর্পণ রীতিমত গ্রন্থও নহে।

তথাপি খানিক অট্টহাসি হাসিয়া লইবার জন্য, কতকটা বেধড়ক আমোদে আমোদিত হইবার জন্য সকলেরই "তিল তর্পণ" কিনিয়া পড়া উচিত—কারণ, ইহার মূল্য "কুল্লে চার আনা মাত্র"।

—ঃ—

গোচারণের মাঠ। শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

বই খানি নূতন, লেখার ধরণটা বিশেষ নূতন; আর, যে বিষয় ধরিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা আরও নূতন। বাঙলা ভাষায় এমন বই আর নাই।

"গোচারণের মাঠ" এক কুড়ি চারি পাতায় শেষ হইয়াছে, আর এই এক কুড়ি চারি পাতাই পয়ারের ছাঁদে লেখা। তবু গোটা বই খানাতে একটীও যোড়া আঁখর নাই; এমন কি যাহাতে য ফলা, র ফলা, ব ফলা লাগে, এমন কথাও আমাদের কৃতী লেখক লন নাই। কারখানা বড় সহজ নহে; [illegible] কোনও গুণ না থাকিলেও, এমন [illegible] লিখিতে পারি বলিয়া লেখক গুমর করিতে

পারেন। তবে, ভাষার সঙ্গে পণ করিয়া বসিলে কাজে কাজেই কোথাও কোথাও টানিয়া বুনিতে হয়, নহিলে, উপায় নাই। সুতরাং ঙ এবং গ যুড়িবার ভয়ে কেবল ঙ দিয়া, ব ফলার ভয়ে 'শোয়াস' লিখিয়া, কাজ সারিতে হইয়াছে; য ফলা এড়াইতে গিয়া 'শামল' বানান করিতে হইয়াছে; আর জায়গায়, জায়গায় 'ভোমরা' 'থির' 'খানিক'—এই রকম কথা চালাইয়াও কুলাইল না দেখিয়া

'গগন পরশী গলা, তীখন, রসাল'

ছাপাইয়া লেখক আপনার এবং ছাপাখানার মান বাঁচাইয়াছেন। যাহা হউক, হইয়াছে খাসা, তবে ভাষার সঙ্গে এমন পালোয়ানগিরি 'খানিক' করা চলে, বরাবর পোষায় না; করিয়াও যে বিশেষ লাভ আছে তাহা বোধ হয় না। ইনিই কি, আর অপর লেখকই কি, কাহারই কাছে এমন রকমের বাহাদুরি দেখিবার সাধ আর আমাদের নাই। কারণ আমরা যদি তাহা দেখিতে চাই তাহা হইলে হয় ত কোনও গুণধাম, গুণপনা 'পরকাশ' করিতে গিয়া ভাষার এবং আপনার 'সরবনাশ' করিয়া বসিবেন।

ভাষার লড়াইয়ের কথা ঢের বলা হইল, বলিব না। দুই চারিটা ভাবের কথা ... কেবল পাড়াগাঁ, পাহাড়ী, আর গাছপালা, গোরুর পাল, রাখাল আর কৃষকের কুলবালা লইয়া কোনও বই আমাদের ভাষায় কেহ লেখেন নাই; সুতরাং এ জাতীয় রচনার ভাষার পুঁজি বাড়িল; ইহার আর ভুল না'ই; তাই বলিয়া যে শুধু ওজনে ভারি করিবার মতলবে ছাই পাঁশ লওয়া হইল, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। "গোচারণের মাঠে" মনোমোহন কবিতা আছে, আর যাঁহারা "গোচারণের মাঠ" তিনি যে আসল কবি তাহার পরিচয় ভরপুর পাওয়া যায়। আমরা বাঙলায় আরও "রাখালী কবিতা" চাই; যিনি দিবেন, ভাষার হিতৈষী বলিয়া আমরা তাঁহার সমাদর করিব।

রচয়িতার সদৃশ কৃতী লেখকগণ বড় একটা কায়দা কানুনের দাস হইতে চাহেন না, তাহা আমরা জানি; এবং কখনও কখনও দাস না হইলেও চলে, দাস হইবার দরকার নাই, ইহাও আমরা মানি। ফলে, তাই বলিয়া,

"জগতে জাগাতে গতি করিল সমীর"

লিখিয়া ভাষাতে পিনাল কোডের সাহেবী অনুবাদ চালাইবার অধিকার ইঁহাদের আছে, এ কথা আমরা কোনও মতেই মানিতে পারি না। আর, সমালোচকের আসনে বসিয়া এ দোষ দেখাইবার অধিকার আমাদের আছে; কারণ এত বড় সমালোচনাতে আমরাও ঘোড়া আঁখর না বসাইয়া কাজ সারিতে পারিয়াছি।

———:———

পাষণ্ডা-নন্দ

দ্বিতীয় কাণ্ড] সন ১২৮৮ ঃ [৩য় খণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

পড়ুন ! পড়ুন ! পড়ুন !

দেখুন ! দেখুন ! দেখুন !

(না হয়)

শুনুন ! শুনুন ! শুনুন !

একবার পড়িলে দশবার পড়িবে !

খারাপী হইলে কেন পড়িবে !!

আর্য্যাবর্ত্ত-মুণ্ড-পাতিনী।

অন্যায়, অজ্ঞান ও অদর্শন

সম্বলিত

সটীক, সচিত্র সাময়িক পত্র ও

সমালোচন।

ভুতপূর্ব্ব রিটকেল বিলাসিনী

সম্পাদক

অকাল কুষ্মাণ্ড শ্রীমান সিদ্ধেশ্বর

বাপান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

যে মাসের যে বারে যে দিন যখন ইচ্ছা লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া পাঠকের গৃহে উপস্থিত হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য সমর্থ, অসমর্থ এবং অনর্থ পক্ষে একাকার—

যিনি যত দিতে পারেন।

যাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক মূল্যও ঐরূপ নিয়মে গ্রহণ করা যাইবে কিন্তু কাগজ প্রেরিত হইবে না।

কাগজ পড়িয়া পশ্চাৎ যাঁহারা মুল্য দিবেন, তাঁহাদের জন্য ধা ছুরী বরাত দেওয়া গিয়াছে।

মূল্য পাঠাইতে হইলে কোম্পানীর কাগজ, নোট, ডাকের টিকিট, কোর্টফি, চেক, দর্শনী হুণ্ডি, খাড়া বরাত চিটী, মনিঅর্ডার নগদ টাকা আধুলী, সিকি, দুয়ানী, পয়সা, ধান, চাল, পাট, সরিষে, মস্‌নে পেয়াজ, রশুন ইত্যাদি যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই মতে পাঠাইতে পারেন।

ডাকের টিকিট এখানে আজ কাল বড়ই দুর্মূল্য সুতরাং কমিশন দেওয়ার দরকার নাই বরং টাকা প্রতি এক আধ খানা কম পাঠাইলেও চলিতে পারে; কিন্তু চাল ধান প্রভৃতিতে কিছু শুক্তি যায়, তজ্জন্য নিয়ম করা গিয়াছে যে মণকরা আধমণ বাদ দিয়া প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

ওজন কমতির জন্য আমরা দায়ী নহি, প্রেরক বিশেষ সাবধান হইবেন।

মূল্য সংগ্রহ এবং গোলাজাত করিবার জন্য বিদেশস্থ ও দেশস্থ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

ইহাঁরা রসিদ দিয়া বা না দিয়া মূল্য উদরসাৎ করিতে পারিবেন।

এজেন্ট গণ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেনারাম ঢেঁকী
পত্নীবাজার (বাকরগঞ্জ)

শ্রীযুক্ত বাবু ফটিক চাঁদ ভরাডুবো
ঘোষের হোটেল (দিনাজপুর)

" বাবু কেবলরাম নিমকহারাম
হাড়কাটা (কলিকাতা)

" উচুরাম নিচুরাম
দক্ষিণদুয়ার (মেওয়ার)

ভাই ভগ্নী এণ্ড কোম্পানী
চাঁদের হাট (ঢাকা)

মিষ্টর ছিঃ ছিঃ বানরজী এস্কোয়ার
মুস্কিল আশান (কাবুল)

আর্য্যাবর্ত্ত মুণ্ডপাতিনী কার্য্যালয়। দেলখোষ গঞ্জ। দিনাজপুর	দেব, দানব এণ্ড কোম্পানী। কার্য্যাধ্যক্ষগণ।

বাগীশের জল্পনা।

(১)

বৈয়াকরণেরা ঘোর স্বার্থপর;—আমি উত্তম পুরুষ, আর তুমি—মধ্যম পুরুষ, সুতরাং অপর যে কেহ অধম পুরুষ! ইঁহারাই কি সমদর্শী নিরহঙ্কারী পণ্ডিত?

(২)

আইনের মাথা মুণ্ড নাই;—অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা আইন কর্ত্তাদের নিষেধ, আদালত খড়্গহস্ত,—অথচ প্রত্যেক স্থলেই অশ্লীল শব্দ! সে দিন দেখি, জজ আদালতের একটী নথীর শিরে লেখা——————

" পদ্মমণি দেবীর অলি রাম চন্দ্র ঘোষ!— ঐ যদি অশ্লীল না হয় তো অশ্লীল কি?

(৩)

মহাভারত।

বেদব্যাস মন্দ আঁকিয়াও লোকের চক্ষে ধূলা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,— যুধিষ্ঠির ভয়ানক স্বার্থপর; কিন্তু তাঁর লেখার কৌশলে যুধিষ্ঠিরের প্রতি লোকের অসাধারণ ভক্তি! ভীম অর্জ্জুন মারামারি, কাটাকাটি ক'রে দ্রৌপদীকে আনলেন,—সে সময় ভায়া বামুনদের দলে,—আর শেষটা মার একটা কথা ধরে ভাগ ল'লেন! আবার, অভিমন্যু কাঁদ কাঁদ মুখে বলেন,—" জেঠা মশায়,— আমি ব্যূহের ভিতর ঢুকতে জানি, কিন্তু বাহির হতে জানি নে! যুধিষ্ঠির জানেন,— অর্জ্জুনের অসাধারণ শক্তি,—তবে তাঁর দাদার কথায় মরণ বাঁচন,—কিন্তু এই ছেলে আবার যোগ দিলে, বুদ্ধি দিলেই সর্ব্বনাশ! এই বেলাই এটাকে মারা ভাল! বল্লেন,— " যাও বাছা, ঢোক,—সবাই তোমার সঙ্গে যাবে,—আমিও পাছু পাছু যাচ্চি! কিন্তু যখন ভিতরে ঢুকে বেচারা মারা পড়ে, তখন কেঁদেই আকুল!

আর কুন্তী সতী,—পুত্র হয় না;—স্বামীর অনুমতি ল'লেন,—এমনি নিষ্ঠা! স্বামী ম'ল, ছেলে গুল বনে গেল—তিনি থাকলেন বিদুরের কাছে!—এর মর্ম্ম?—কুন্তী অসামান্য সতী!!

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

পৌষ মাসের বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমালোচনে সব ভ্রমের কথা! কণ্বকে দেব প্রকৃতির মানব বলা হয়েছে,—কিন্তু কণ্বের কাযটা কি?—চুপি চুপি শকুন্তলা দুষ্মন্তে, বিয়াই বল—আর যাই বল, হ'য়ে গেল; শকুন্তলা ঠাকুরুণ গর্ভবতী। কণ্ব ভাবলেন, রাজা হস্তগত, আর উড়িধান কুড়ুতে হবে না,— আহ্লাদে গদগদ; সমালোচক বল্লেন—কণ্ব দেব প্রকৃতির মনুষ্য! কিন্তু এখনকার কোন বড় মশায় হলে লোকে কত কথাই বল্ত! হয়ত শার্ঙ্গরব আবার একটা আশ্রম বদল কর্ত্ত।

এখন সকলের চক্ষু ফুটেছে!—কণ্বের অপেক্ষা কত বড় লোক কত বড় বড় কায কর্চ্চে,—কিন্তু লোকে গালাগাল দেয়! এখন তো আর মুনি ঋষি নাই, সে রকম কবিও নাই, যে সবই ভাল বল্‌বে! কিন্তু দেখতে গেলে,—এখনকার সেনজা মশায়ও যা!—কণ্বও তা! তবে. কবি চূড়ামণি কালিদাসের বাহাদুরী!!

সমালোচক বলেছেন,—"শকুন্তলা রঙ্গ বোঝেন, কিন্তু রঙ্গ কর্ত্তে পারেন না। কি ভ্রম!!—ছুঁড়ীর রঙ্গ দেখে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী উলুত প্লুত, জর্ম্মানেরাও হাস্‌ছে,—সে যদি রঙ্গ না জান্‌তো তো জানে কে?

প্রিয়ম্বদা দুতী, বড় চালাক,—না পারে এমন কাযই নাই! অনসূয়াও কম ঠাকুরুণ নয়! তিনটা ছুঁড়ী আচ্ছা ঢলান ঢলাইয়াছে; সমালোচক কেন যে বল্লেন, অনসূয়া রঙ্গ শেখেন নাই,—তিনিই জানেন! তবে অনসূয়া কিছু গম্ভীর—অন্তঃসলিলা!! স্নেহময়ী গৌতমী পিসী জানেন সব,—বোঝেন সব,—কিন্তু ন্যাকা!

দুষ্মন্ত না পারেন এমত কর্ম্মই নাই। রাজা, বনে গিয়াও লম্পটতা! এখনকার হলে, প্রজারা পার্লেমেণ্টে দরখাস্ত কর্ত্ত,—খবরের কাগজে লিখত! আর তেমন জায়গায় হলে, গোবেড়েন পিটুত। তখন তিনিই হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, তায় আবার বুনর বাড়ী!—কেহ কিছু বল্লে না।

কিন্তু কালিদাস প্রকৃত কবি। এই একটি চরিত্র এমনি আঁকিয়াছেন যে, যে পড়বে সেই ভুল্‌বে।—এর উপর যদি সমালোচক ঐ সব চরিত্র লোকের আদর্শ কর্ত্তে বলেন,—এই শিক্ষা দেন,—তবে এই শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদার ন্যায় অসংখ্য নায়িকা ও কণ্ব, দুষ্মন্তের ন্যায় অসংখ্য নায়ক বিরাজিত ভারতের—গয়া!

সাতাশী সাল।

সাতাশী সাল চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর আর এক বৎসর ফুরাইয়াছে। ইহাতে সুখ দুঃখের কিছুই তো দেখি না। নিত্যই এক এক বৎসর যাইতেছে; সাতাশী আটাশী কেবল গণনার কথা। যদি সুখের দুঃখের কথা তুলিতে হয়, কি বলিতে হয়, তাহা হইলে দিন গেল বলিয়া সুখ দুঃখ প্রকাশ করাই উচিত। কিন্তু দিনের দাম বোঝে, এমন লোক অল্প; তাই দীর্ঘ কাল পরে নিঃসাড়ে দিনের পর দিন—বহু দিন—কাটাইয়া

নিদ্রিতের পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ন্যায় বর্ষান্তে এক দিন এক বার, বৎসর গেল বলিয়া লোকে অধরোষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহার পর যে ঘুম, সেই ঘুম। সাতাশী সাল বহিয়া গেল; দশ জনে বলে, আমিও এক বার বলি।

হরি বলো, দিন গেল! তিনটী তুড়ি দিয়া বিকট হাই তুলিয়া সাতাশী সালের অন্তিম দিনের অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাউক। যেমন করিয়াই হউক, যে সময়েই হউক, হরিনাম লইলে ফল আছে। যে অসাড়, নিঃস্পন্দ, ক্রিয়াহীন, প্রাণবর্জ্জিত, তাহার জন্য হরি নাম বিশেষ মাহাত্ম্য ধারণ করে। "যার কেউ নেই তার হরি আছে।" যখন নির্জীব মানবের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে হয়, তখন তাহাকে "হরি হরি বলো, হরিবোল" বলিয়া হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা আছে, রীতি আছে। সাতাশী সালের বঙ্গবাসী সমীপে, একবার "হরি বলো, দিন গেল" বলিয়া হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

যাহা বলিলাম তাহা সত্য। কিন্তু তবু উহারই মধ্যে একটা কথা আছে। যে মাছটা সুত কাটিয়া অথবা জাল ছিঁড়িয়া পালায়, সেটা খুব বড় মাছ; আর যে মানুষটা মায়াসূত্র কাটাইয়া অথবা ভবজাল ছিন্ন করিয়া লোক-লীলা সম্বরণ করে, সেই খুব বড় লোক।

চুনো মাছের জালের ভিতর থেকে একটা দেড় ছটাক ওজনের পোনা মাছ লাফাইয়া পালাইল; অমনি "খুব মাছটা পালিয়েছে, মস্ত মাছটা হাত ছাড়া হয়েছে, মাছটা খুব প্রকাণ্ড" ইত্যাকার বিস্ময় ক্ষোভ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিবিকার জ্ঞাপক ধ্বনি হইয়া থাকে। সেই রূপ মনসা রাম রায় আমরণ গৃহিণীর গহনা চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, আর পেটের ভিতর মদের ভাটি খুলিয়া বমনোদ্গারে পাড়া তোলপাড় করিয়া অব-

শেষে এক দিন শান্তি নিকেতনে যাত্রা করিলেও—“এমন মানুষ, এমন দাতা ভোক্তা, এমন ক্রিয়ার্ধান ব্যক্তি আর হইবে না” বলিয়া হাহাকার শব্দও শোনা যায়। এমন অবস্থায় সাতাশী সাল যে একটা খুব সালের মত সাল চলিয়া গিয়াছে, এ কথা বলিলে সামাজিক প্রথার সম্মান ভিন্ন অবমাননা করা হইবে না। এ হিসাবে সাতাশী সালের একটা ইতিহাস লিখিয়া সংসারের উপকার করিলে দোষ হইতে পারে না; বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে!

ইতিহাস লিখিতে হইলে বিস্তর কথা লিখিতে হয়। আমি প্রধান প্রধান কথা গুলা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। পারলৌকিক বিবরণ।

যাহার বিনাশ নাই, বিবর্ত্তন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, গতি নাই স্থিতি নাই, সেই পুণ্য-আত্মার ধাম-যাত্রার উল্লেখ করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত; সেই জন্য বঙ্গের পারলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা প্রথমেই করা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে সাতাশী সাল বঙ্গের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া পরিগণিত হইবে। পাপাত্মার দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনেক গুলি পুণ্যাত্মা ভব ভবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(ক) যাহাদের গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের খুব জোর কপাল; বুটের সুপারিশে প্লীহা পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া আত্মারাম প্রাণপক্ষী উড়িয়া যাইবে, কিম্বা গুলিখোরের বদনাম না লইয়াও গুলি ভক্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চভূতের অধীনতা হইতে পাপদেহের পাপপ্রাণ পরিত্রাণ পাইবে, এর চেয়ে ভালো কথা আর কি আছে, বলো? তা' সাতাশী সাল এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় নাই।

কতকগুলি আত্মা ফাঁসীযাত্রা করিয়াছে; ইহাদের উন্নতিও কাল্পনিক

কথা নহে, কারণ ইহারাও গৌরাঙ্গের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়াছে।

ভক্তি মার্গে এই পর্য্যন্ত।

(খ) আরও অনেকগুলি আত্মা গৃহিণীর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া, ভ্রাতাকে বিষয় বিভবের হিসাব বুঝাইয়া দিতে অপারগ হইয়া, ছেলের স্কুলের মাহিয়ানা যোগাইতে না পারিয়া, মেয়ের বরের দাম দিতে অসমর্থ হইয়া; ও দিকে কতকগুলি আত্মা গহনা বেচিয়া স্বামির মদের যোগান যোগাইতে না পারিয়া, পরপুরুষের কোমর ধরিয়া নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া, চেয়ারে বসিয়া "অপূর্ব্ব প্রেম" নবন্যাস পড়িবার সময়ে দুষ্টমতি শাশুড়ী কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়া———ইত্যাকার নানা কারণে নানা প্রকারে নানা আত্মা কড়ি কাঠে দড়ি বন্ধন পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া আরাম কুঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন যাহারা জ্বরের সঙ্গে বিশিষ্ট আত্মীয়তা প্রযুক্ত, অথবা ওলাউঠার অনুল্লংঘনীয় নির্ব্বন্ধ জন্য বা এবম্বিধ অন্যবিধ কারণে ডাক্তার বাবুর অনুরোধে, হাতুড়ের উপরোধে, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দলও নিতান্ত পাৎলা নহে।

আর যাহারা রাজার সম্মান রক্ষার জন্য শুদ্ধ পেটের দায়ে বাস্তুভিটার মায়া ছাড়িয়া লোকান্তরে বসবাস করিতে গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা যতই কেন হউক না,—তাহারা গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। আর গণ্য মান্য লোক ভিন্ন অন্যের হিসাব রাখিয়া পাঞ্চনন্দই বা আত্মলাঘব করিবেন কেন?

তদনন্তর ছাঁকা পরলোকের কথা এই খানে শেষ করিয়া ইহলোক মিশ্রিত পরলোকের কথা বলা যাইতেছে। অর্থাৎ ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকের ব্যবস্থা যাহারা করিয়া থাকেন, সেই ধার্ম্মিক দলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে।

সাতাশী সালে ধর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। খৃষ্টান রাজা আফ

গানস্থানে এক গণ্ডে চপেটাঘাত খাইয়া দক্ষিণ আফেরিকাতে দ্বিতীয় গণ্ড পাতিয়া দেন; এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ সার্থক করেন।

মহম্মদের শিষ্যগণ এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে তরবাল চালাইবার সুবিধা না দেখিয়া হোটেলে খানশামা রূপ ধারণ পূর্ব্বক হারাম অর্থাৎ শূকর মাংস ছেদন করিয়া ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ফলার এবং সাহেব সুবাকে খানা দিয়া "সর্ব্ব জীবে সমান দয়া"; পড়িয়া মার খাইয়া কথাটী না কহিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া হিন্দু সন্তান কুলধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মী সকল ধর্ম্মের উপাদেয় খিচুড়ি পাকাইয়া অকাতরে বিতরণ পূর্ব্বক সগৌরবে নববিধানের ধ্বজা তুলিয়া ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে ত্রুটি করেন নাই।

আর ইহার উপর উপধর্ম্ম, বাজে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি কত প্রকারে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—তাহার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই এবং সংক্ষেপে বর্ণনাতীত।

মুখ্য কল্পে ধর্ম্মের এই ভাব; গৌণ কল্পে চতুর্দ্দিকে সুফল। আর্য্যসন্তান এত হঙ্গামেও জাতি বাঁচাইয়া চলিয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞানী জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া ভ্রাতৃভাবে সমগ্র পৃথিবীকে একাকার করিয়াছে; খৃষ্টভক্ত সর্ব্বত্রে হোলি স্পিরিট্ * অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রসার করিয়া দিয়াছে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য তিরোহিত হইয়াছে; লোকে বিরোধ করা ভুলিয়া গিয়াছে; দলাদলি উঠিয়া গিয়াছে; নাপিত পুরুত বন্ধ করা বন্ধ হইয়াছে; সুতরাং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু সংসার হইতে অপসারিত হইয়াছে। অতএব সাতাশী শাল প্রকৃত ধর্ম্মের সাল।

* বুঝিতে পারিলাম না। খোলা ভাটীতে কি হোলি স্পিরিট্ (wholly spirit) বিক্রি হয়। ছাপাখানার ভূত।

শেয়ালের সভা।

"বন্ধুগণ! সকলেই বলে ঐক্য এবং চীৎকার উন্নতির উপায়। বন্ধুগণ! আমরা সমস্বরে চীৎকার করিতে কখনই ত্রুটি করি নাই। মানুষ ত হইতে পারিলাম না।

২। রাজনৈতিক বিবরণ।

সাতাশী সালের ইতিহাসে অপরাপর প্রসঙ্গ না কি পারলৌকিক কথার মত বড় অঙ্গের নয়, সেই জন্য পাইকাতে বলা যাইতেছে।

রাজনীতির ভিতর দুইটা মূল তত্ত্ব; তাহারই ডাল পালা লইয়া ভাঙ্গচুর করিয়া যত যাহা বলা যাউক। মূলতত্ত্ব দুইটা এই যে, এক আছেন রাজা, তিনি ইংরেজ; আর এক আছে প্রজা, সে নেটিব। ইহাদের সম্পর্কও দুইটী কথা লইয়া———আদান আর প্রদান; তা' প্রজা টেক্স দিতে ক্রুটি করে নাই, রাজাও লইতে ক্রুটি করেন নাই। সুতরাং রাজনীতির মূল সুত্র সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

যদি বলো প্রজাপালন আর রাজভক্তি লইয়াই রাজনীতি, তাহাতেও পঞ্চানন্দের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সাতাশী সালে ইংরেজ অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছেন; সঙ্গতি অনুসারে ছেলেকে যেমন লেখা পড়া শেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা করা হইয়াছিল; উচ্ছৃঙ্খলের শাসন, বেত্তরিবতের সোহবৎ, দুষ্টের প্রহার—এ সমস্তই হইয়াছিল। আর মিতাক্ষরা শাস্ত্র না কি নিতান্ত সেকেলে, সেই জন্য বাপ থাকিতে বেটার ধনাধিকার হইতেই পারে না; তা' ইংরেজও মিতাক্ষরার মতে চলেন নাই।

রাজভক্তি পক্ষে, প্রজারাও অকাতরে রাজসেবা করিয়াছে। কেনই বা না করিবে? পেট তো চলা চাই। গুলি ডাণ্ডা, বঁটি দা, এ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া সুশীল সুবোধ বালকের মত প্রজারা ২৪ ঘণ্টা মেহনৎ করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়াছে, আর গুরু দক্ষিণার ভাবনা ভাবিয়াছে।

রাজনৈতিক ডাল পালা উপলক্ষে এই কথা বলা উচিত যে জমীদারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রজাদের, আর প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া জমীদারদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষে একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ভিন্ন সাতাশী সালে তিন শ পঁয়ষট্টি খানি আইন জারি হইয়াছে, এক হাজার দিস্তা কাগজে দরখাস্ত হইয়াছে, পাঁচ হাজার ঘন ফুট বক্তৃতা হইয়াছে,

আর দশ হাজার বর্গ মাইল দেশীয় সংবাদ পত্র চলিয়াছে। সুতরাং রাজা এবং প্রজা উভয়েই সদ্ভাব এবং সৌহৃদ্য বিষয়ে লক্ষ যোজন অগ্রসর হইয়াছেন।

৩। বাণিজ্যিক বিবরণ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই কথার গৌরব বুঝিয়া বিস্তর ভারতবাসী তৈলের বিনিময়ে উপাধি, মানের বিনিময়ে পদ, খোশামোদের বিনিময়ে অর্দ্ধচন্দ্র, জাতীয়তার বিনিময়ে করমর্দ্দন, ধুতি চাদরের বিনিময়ে কপিত্ব, স্বতন্ত্রতার বিনিময়ে অনুকরণ———ইত্যাদি নানা রকমে নানা কারবার করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের মূলধনের বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

ইংরেজও বাণিজ্য প্রধান জাতি, ভারতবর্ষে অনেক কারবার করিয়াছেন। রজত ও শোণিত লইয়া অথচ মাটীর দরে আফিঙ, মদ, গাঁজা, চণ্ডু বেচিয়াছেন; ইহাঁদের বিচার না কি খুব খাঁটি এবং সরেস, তাই অত্যল্প মাত্রাতে দিয়াও অনেকের সর্ব্বস্ব লইতে পারিয়াছেন; ষ্টাম্প বিক্রয়, টিকিট বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারাও ইংরেজের বিস্তর লাভ হইয়াছে। আর কাবুল অঞ্চলে যথেষ্ট অপযশ লইয়া ভারতের ধন প্রাণ বিক্রয় দ্বারা ইংরেজ অল্প লাভ করেন নাই।

সংবাদ এই রূপ যে সাতাশী সালে সাহিত্যের বাজার কিছু নরম ছিল, আমদানি রপ্তানিও কম হইয়াছিল। তা' হউক, কিন্তু তাহাতে পচা সড়া মালের কাট্‌তি যে কম হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

৪। সামাজিক বিবরণ।

খবরের কাগজওয়ালা, সুশিক্ষার টিকাওয়ালা প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা বলেন, এবং ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে সমাজের কথায় আমাদের কাজ কি? পঞ্চানন্দও তাই বলেন। বাস্তবিক, বাল্য বিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, ভদ্রলোকের সম্মান, ইতরলোকের অজ্ঞান, যুবাদের দীক্ষা, ছেলেদের শিক্ষা, বারোয়ারি, দলাদলি, পঞ্চাইতি, কি মদ মাতালের ঢলাঢলির কথায় থাকিয়া দরকার কি? ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই উন্নতির মূল; কেহ কাহারও

তোয়াক্কা রাখিবে না, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না—তবে তো মঙ্গল। তাই যদি হইল, তবে কে কি খাইল, কে কোথায় যাইল, রাম কি বলিল, হরি কি করিল, কাহার কেমন সংস্কার, কিসে কার উপকার—এ সকল কথা ভাবিয়া তাসের সময়, টপ্পার সময়, ইয়ারকির সময় কেন বৃথা নষ্ট করিতে যাইব? সমাজ আছে, আপনার আছে, তাহাতে আমারই বা কি, আর তোমারই বা কি? সমাজে মাহিয়ানা বাড়ে না, রাজা বাহাদুরি ঘটে না, কাজ কর্ম্ম যোটে না, দেনা পাওনা মেটে না, কিছুই হয় না—তবে সমাজের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক?

এই মহান ভাবের পুষ্টি সাতাশী সালে হইয়াছে।

৫। সাহিত্যিক বিবরণ।

একা পঞ্চানন্দের কথা বলিলেই সমগ্র সাহিত্যের কথাই বলা হইল। সাতাশী সালে স্বতেজে, স্বজোরে, লোকযোগে, ডাকযোগে, আপনার সুযোগ বুঝিয়া, পরের অনুযোগ সহিয়া পঞ্চানন্দ চলিয়া আসিয়াছেন। ছ কোটি সাড়ে সাতাশী লক্ষ বঙ্গবাসী সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক ভারগ্রহ করিয়া পঞ্চানন্দ পাঠ করিয়াছেন। কেহ রাধাবল্লভ জীউর বনমালা বন্ধক দিয়া, কেহ দুর্গোৎসবের ব্যয় কমাইয়া দিয়া, কেহ শুঁড়ির খাতায় বাকী রাখিয়া, কেহ পেট্রিয়টিক ফণ্ডে দাতব্য না করিয়া—এই রূপে যিনি যেমনে পাইয়াছেন, আড়াই টাকা বাঁচাইয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কাহারও কাহারও মূল্য বাকী রাখা অভ্যস্ত ছিল; সাতাশী সালে তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সকলেই অগ্রিম মূল্য দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জাতীয় গৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কাজে কাজেই অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পঞ্চানন্দ এক চিত্তে এক ভাবে আত্মকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতে পারিয়াছেন।

যাঁহারা যথার্থ সুশিক্ষিত, কেবল তাঁহারাই সাতাশী সালে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেমন পাঠক অপেক্ষা লেখকের সংখ্যা অধিকতর ছিল, সাতাশী সালে আর সে রূপ হয় নাই। সাহিত্য সংসারে আর এক সুলক্ষণ এই দেখা

গিয়াছে, প্রত্যেক লেখকই স্ব স্ব প্রধান 'মা হইয়া সকলে মিলিয়া লিপি সাহায্য দ্বারা স্বীয় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান এবং পঞ্চানন্দের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং সাতাশী সালে কি রাজদ্বারে, কি সুহৃদসমাজে—সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ প্রভাব দেখাইয়া পঞ্চানন্দ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

অতএব সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক পঞ্চানন্দ পুনশ্চ কুশাসন গ্রহণ করিতেছেন।

আর সংপ্রতি যে পরচ্ছিদ্রদর্শী পঞ্চানন্দ "সঙ্গ" দোষে সাধারণীর কাছে ধরা পড়িয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে লোকের ক্ষতি নাই, পঞ্চানন্দেরও বৃদ্ধি নাই।

এখন অষ্টাশী সাল এই রূপ চালাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না।

প্রভুভক্ত ভৃত্য।

সাহেব রাগত হইয়া খানশামাকে——
"শূয়র কা বাচ্ছা——"
খানশামা যোড়হাত করিয়া বলিল,
——"হুজুর মা বাপ সব বল্‌তে পারেন।"

বিদেশের সংবাদ।

[১]

বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলি ওরফে আর্ল বিকন্সফীল্ড নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ইহুদি ব্যবসায়ে পুস্তক লেখক ছিলেন; আর, মধ্যে বারেক দুই বার তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ইংলণ্ডে মন্ত্রী হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সকলেরই মন্ত্রী হইবার অধিকার আছে। এই লোকটার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া অনেকে বিস্তর কাগজ কালি নষ্ট করিয়াছে, আর যাহার মনে যে কথার উদয় হইয়াছে, তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে বেঞ্জামিনের জন্য বঙ্গবাসীর মাথা ব্যথা, অন্যায় কথা। এ দেশে অনেক গ্রন্থকার আছেন; কিন্তু বঙ্গবাসী সারগ্রাহী, সুবিবেচক এবং প্রতারিত হইবার পাত্র নহে, সেই জন্য সে সকল গ্রন্থ বড় একটা বিকায় না; ইংলণ্ডের লোক বোকা, তাই ডিজ্‌রেলির পুস্তকের এত পসার।

আর, ইহুদি হইয়াও ডিজ্‌রেলি মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে গৌরব করিতে হইবে, তাহারও কোনও অর্থ নাই। ডিজ্‌রেলি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হওয়াতেই

এরূপ ঘটিয়াছিল তা এ দেশেও অনেকে জাতি দিয়া মেমের সঙ্গে নাচিতে পাইয়াছেন। সুতরাং ইহাতে প্রশংসার কিছুই নাই।

টের পাইতেন, ডিজ্‌রেলি যদি এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন। পুঁথির খশড়া বগলে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও, তাঁহার অন্ন যোটা ভার হইত। সই সুপারিশের জোর থাকিলে বেজুমিঁয়া বড় জোর একটা ডিপুটিগিরি পাইতেন। (মনে থাকে যেন, তাঁহার বি, এল্ পাস ছিল না, মফঃস্বলে তিন বৎসর মোক্তারের খোশামোদও করেন নাই, সুতরাং মুনসুফি হইবার কোনও আশাই ছিল না।)

তাহার উপর সেলামের কেতা দোরস্ত থাকিলে, আর সাহেবদের বাড়ী বাড়ী দু বেলা ঘুরিয়া সত্য মিথ্যা দশটা বলিবার ক্ষমতা থাকিলে বেজু চাচা হদ্দ খাঁ বাহাদুর হইতে পারিতেন। বাস্তবিক এ দেশে কাহারও চালাকি খাটে না; ইংলণ্ড বোকার জায়গা, সেখানে সবই হইতে পারে। তবে কি ডিজ্‌রেলির কথা লইয়া বাড়াবাড়ি কাড়াকাড়ি করা এ দেশে ভাল দেখায়?

[২]

আরও একটা লোক য়ুরোপে মারা গিয়াছে,—রুষিয়ার জার।

এ মৃত্যুর বিচার কঠিন সমস্যা। রুষিয়া সন্তানগণের ভয়ানক আক্রোশ, তাহারা জার রাখিবে না। প্রজার মনোরঞ্জন করে এমন ভূস্বামী তাহারা চায়। এ ভাবে দেখিতে গেলে প্রজাদের দোষ মনে হয় না। বাস্তবিক, চক্ষের উপর এ অত্যাচার সহিবে কেন? আর লোকের যদি অসহ্য হয়, তবে জারই বা কতক্ষণ থাকিতে পারে?

আর এক পক্ষে মনে হয় প্রজারা মিলিয়া মিশিয়া, সহিয়া বহিয়া থাকে না কেন? বঙ্গ দেশের প্রজা কেমন ভাল মানুষ।—ক্ষুদ্র জমীদারকেও ভূস্বামী নাম দিয়া কত আদর, কত ভক্তি, কত যত্ন, কত সম্মান করে! অথচ সকলেই জানে যে ইহারা জারেরও অধম। অদ্য সূর্য্যাস্তে আবাহন, কল্যকার সূর্য্যাস্তে বিসর্জ্জন। তবে কি জানো, এখানে ধরণী সর্ব্বংসহা।

ভালো হউক, মন্দ হউক, এ কথাতেও বঙ্গবাসীর, ভারতবাসীর না থাকাই উচিত; এ দেশের ও ভাবনা ভাবিবারও কোনও হেতু নাই; যে হেতু আমাদের মালিক—মহারাণী ভারতেশ্বরী!

প্রকৃত কারণ।

অনেকে মনে করিয়া থাকে যে মদের দোকান অধিক হওয়াতেই মাতলামি বাড়িতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়।

সরকার বাহাদুরের অনুমতি না লইয়া কেহ কেহ না কি মদ বিক্রয় করে, তাই আবকারীর একটা নিয়ম আছে যে, মদ ধরিতে পারিলে, যে ধরে তাহাকে বক্‌শিস্ দেওয়া হয়। এই বক্‌শিসের লোভে অনেকে চুপি চুপি মদ ধরে; বক্‌শিস পাউক আর নাই পাউক, ধরিলে আর কেহ ছাড়িতে পারে না। ইহাই মাতলামি বাড়িবার প্রকৃত কারণ।

তা' তো যথার্থ।

রামমণি পঞ্চাশ বৎসরের বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা, পীড়ায় শয্যাগত; বড়ই কাহিল, নিতান্ত ক্ষীণ, তাহাতে আজি আবার একাদশী। রামমণির আত্মীয়বর্গের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। কি করে, বিব্রত হইয়া গোবর্দ্ধন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

গোবর্দ্ধন ডাক্তার রামমণির বুক ঠুঁকিয়া প্রথমতঃ পঞ্জর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন, জিহ্বা টানিয়া প্রাণ চমকাইয়া দিলেন, ঘড়িতে নাড়ী দেখিলেন, তার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন——দোয়াত, কলম, কাগজ।

রামমণির এক জন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিল—বাবু দেখলেন কেমন? তীরস্থ করবার ব্যবস্থা করা যায় কি?

গোবর্দ্ধন ডাক্তার তীরস্থের খবর জানেন না; রোগীর অবস্থা খারাপ, উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—৪ ঔন্স ব্রাণ্ডী আধ ঘণ্টা অন্তর ছ বার। সঙ্গে সঙ্গে পথ্য মুর্গীর সুরুয়া; বীফ্-টী হইলে আরও ভালো।

"সে কি মশায়! বামুনের বিধবা যে? তায় আজ আবার একাদশী!"

"আমি তার কি করব বলো? পুস্তকে বয়োভেদে ঔষধের মাত্রা ভেদের কথা লেখা আছে; কিন্তু ধর্ম্মভেদ, তিথি ভেদের কথা তো কিছু নাই। তোমাদের মনোমত না হয়, আমার বিজিট দাও চলিয়া যাইতেছি, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগ করি নাই, এই আমার সুখ।

গদাধর একটু গোঁয়ার গোচ; এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন——"মেজো কাকা, ঠাকুরমার যা হয় হবেএখন; আগে এই গোবরা বেটাকেই তীরস্থ করা যাক্। কি বলেন?"

মান!

"প্রাণ অতি তুচ্ছগণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম! এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে! এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে

উপদেশ স্থলে বলে! কোথায় অমূল্য, অতুল্য. পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ——আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া মান! ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা ধুতি, ছড়ি ছাতি, তেমনি মান;——দাম দিলেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে যত চাই, ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া, তাহাও নয়; টাকা কড়ির ত কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান আপনার ঠাঁই" —কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার যো নাই;——হয় ইহা স্বার্থপর শঠের কথা, নয় বুদ্ধিহীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিম্বা কিছু পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দু দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতি টা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল্ মান হইবে; তবে আর মুখ দেখান বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইলে ত কেহ বলে না যে, না ভাই তুমি সুখতলা হারাইয়াছ, তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখতলার অভাবে তবু পায়ে লাগে। আর, মানের অভাবে?———কৈ আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্ব্বোধের কথা বলিতেছিলাম। ইহারা বলে মান গেলেই সব গেল। খাটি জানিবে, বুদ্ধি শুদ্ধি থাকিতেও যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়; হয় সে মানের দালাল, খরিদদার যুটিলেই তাহার লাভ; নয় ত সে কোন্ দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্র-গিরি ধরিয়াছে; তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্য্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার—চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি ব্যব-

সায়। আর, নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলের দিন মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেঁচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়; নির্ব্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল,—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এই এত কাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী; দেখিও আভাস পাইবা মাত্র কাকের পালের কলরবের * মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে——মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাছে সাবধান! কি রাজ দ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্ব্বত্রই আছে; সেই পঙ্কমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে——চাই মা——ন, বড় মান খুব মান, সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না; তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার ফিকির। তমঃস্মুক লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত———" সম্বোধন করে; তুমি তখন মনে করিতেছ, সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই; কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার—টাকা। বল দেখি কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্ন চিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাত ছাড়া করিও না, তোপ মারিবে বলিলেও হাত ছাড়া করিও না; বুঝিলে ত? তোপ মারিলেও——না! আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ! সেই রূপ আঁখর দিয়া বলিলেও ভুলিও না; কীর্ত্তন গাইবার সময়ে আঁখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা ত জান? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার

* কাক গুলা কি গোরু, যে কাকের পাল বলা হইল? আমাদের মোটা রসীকের ভাষার বাঁধুনী যেমন, ন্যায়শাস্ত্রের গাঁথনীটা তেমন নয়। পঞ্চানন্দ।

হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়ে চিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা, আর ভৃত্য শামা— সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেইখানেই তোমার মান; তুমি আপনার আপনি বাবু বলিলেই বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা; তাহাতে তোমার অন্য বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাদুরি চাই না, সত্যিকার প্রজার পুরী চাই না। চাই কি, ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার, সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্‌পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাক্কা খেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও ত মান। আর যদি সে সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি? তোমার নেশা ছুটিলে, চোখ ফুটিলে, দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে সেই; মোদ্দা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙ্গা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে দুটী পয়সায় তোমার সঙ্গ দোষ, চরিত্র দোষ, সকল দোষ ধুইয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে; তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্ম্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবুকে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে; আর ধোপা ত দু পয়সার চাকর! মানের জন্য আবার ভাবনা?

বাঙ্গালা দেশে কেহ ইতিহাস লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না। সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে; কাজ কি বাবু সে কথায়? এখন, এই উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার যদি গাড়ি ঘুড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ্ ছড়ি, চশমা দাড়ি সমস্তই থাকে, তাহা হইলে কাল্ আমার কি ছিল, আমিই বা কে ছিলাম—সে খোঁজ খবরে তোমার দরকার কি? বাস্তবিক দরকার কিছুই নাই; আর দরকার যাহাতে নাই, বাঙ্গালীও তাহাতে নাই। বাঙ্গালী ত অজ্ঞান নয়। "ভুক্তে পশ্যন্তি

বর্ব্বরাঃ”—যে জাতির ইষ্টমন্ত্র সে কি কখনও অজ্ঞান হয়?

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমার ও নয়, মান আমারও নয়; মান যায়ও না আইসেও না; ফল কথা মান মানীর; যখন যাহার মানে দরকার, তখনই তার মান! মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারই নাই, তখন মানের জন্য প্রাণ দেওয়া, ধন দেওয়া, দূরে থাকুক, এমন যে কল্কিকার জিনিশ ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালে ভদ্রে ফাঁকি দিয়া, কি ঝুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায় ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ বস্!

আর একটুকু।

কতকগুলি ব্রাহ্ম "ভ্রাতা" প্রস্তাব করিতেছেন, যে মৃত দেহ পোড়াইলে আত্মার অতিশয় যন্ত্রণা হয়, অতএব না পোড়াইয়া গোর দিবার নিয়ম প্রচলিত হউক।

প্রস্তাব অতি সৎ এবং সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পঞ্চানন্দ ইহাতে সম্মত আছেন; তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে "ভ্রাতা" সকলকে পুঁতিতে পারিলে আরও ভালো হয়। কেন না, তাহা হইলে সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্তির পক্ষে আর সংশয় থাকিবে না।

চোরা চিঠি।

পঞ্চানন্দ ঠাকুর,

মুন্সীগঞ্জের ডাক মুন্সী আমার পরমাত্মীয়, সুতরাং লোকটা একটু রসিক ইহা বলাই বাহুল্য। ডাকের চিঠির ভিতর অনেক রকমের আমোদের কথা থাকে, ডাক মুন্সী ভায়া সেই লোভে, লেফাফার যোড়ের জায়গা রসনা-রসসিক্ত করিয়া অভ্যন্তরের গূঢ় তথ্য মধ্যে মধ্যে জানিয়া লন। নির্দ্দোষ রসিকতা বাঙ্গালীর সম্ভবে না, সুতরাং এ বিষয়ে ইহাঁকে অপরাধী করিতে পারিলাম না। সে দিন এই রূপে এক খানি পত্র ইনি আমাকে পড়িতে দেন, শেষে অনুরোধের বশে নকল করিতেও দিয়াছেন। অবিকল নকল পাঠাই; বোধ হয়, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভায়ার অনুরোধে লেখকের নাম গোপন করিতে বাধ্য হইলাম; কারণ রসিকতা অপেক্ষা চাকরির মূল্য বেশি।

শ্রীপরিচিত পূজারী।

"আমার প্রিয়তমা জাহ্নবী,

কএক দিবস যাবৎ উৎসবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকা জন্য তোমারে পত্র লিখিতে পারিয়াছিলাম না। তোমার প্রেম যদিও পিতার প্রেমের থাকিয়া লঘু জ্ঞান করি না কিন্তু ধর্ম্মের দ্বারা উন্নতি সম্ভব হয়, সে বিষয়ে তোমাকেও উপদেশ দিতে আমি বাধ্য আছি। সেই জন্য আমি সাহস পাইতেছি যে উৎসবের বৃত্তান্ত জানাবে

তোমার নিকট আমার কর্ত্তব্য করণ হইবে, এবং সেই সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ব্যবহারে অমনোযোগ না হওন প্রকাশ পাইবে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় যে প্রকার উৎসাহের সঙ্গে আমার পৃষ্টদেশে হস্ত দিয়া ধর্ম্মের পথে ঠেল দিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে স্বর্গের দ্বার অধিক ব্যবধান নাই, কেবল নিকট হইয়া আসিতেছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতেছে, জল সওন হইতেছে, হোম হইতেছে, শান্তি হইতেছে, অভিষেক হইতেছে, —শারদা পূজার কালে পাঠা কাটন হইবে কি না, এ কাল যাবৎ নিশ্চয় না; ফল, হওন সম্ভব করি। কেবল তাহাই না, মুসলমানের উজু আজান, খৃষ্টানের রক্ত মাংস ভক্ষণ সেও হইতেছে।

এখনে জানা গেল যে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যের কোচা টিপিয়া ধরিতে পারিলে স্বর্গ যাওন পক্ষে বাধা ঘটন হইতেই পারে না। বেদ, বাইবল, কোরাণ, জেন্দাবস্তা, ললিত বিস্তার, চৈতন্ত চরিতামৃত, ব্রতমালা, আরব্য উপন্যাস এবং সুলভ সমাচার এই নববিধানে স্বর্গ নিকেতনের নবদ্বার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়ের করুণার জন্য কেহই এখন আর গুহ্য না, সকলেই সুপ্রকাশ, এমতে পরকালের চিন্তা আর নাই। তোমারে এই ক্ষণ আমার অনুরোধ যে তুমি সেমন্ত গৃহিণী আর থাকিবা না, প্রেম চিন্তা এবং বৈরাগ্য অভ্যাস করণে মন দিবা।

আমার যাত্রার দিবস নিশ্চয় হইয়াছে। সাহেব হইয়া যখনে প্রত্যাগমন করিব, সে কালে তোমার মুখ চন্দ্রে উল্কী কলঙ্ক না দেখিতে হইলে বিলক্ষণ আনন্দ পাইব, ইহা মনে রাখিবা। দুই পয়সার সাবুন কিনিয়া হস্তে এবং মুখের পর মাখিবা, তাহাতে রং গোরা হইবে এবং উল্কীও পুছিয়া যাইবে। বক্রী আষ্ট অঙ্গ গাউন পরিলে লুকান থাকিবে তাহাতে সাবুন মাখিয়া পয়সা খর্চ করিবা না।

আইসন কালীন যেমন যেমন কহিয়া আসিয়াছিলাম, সেই মত ইংরাজী শিখনে মন রাখিবা। ধন দাদারে এবং সোণা কাকারে দেখিলে মাথার কাপর ফেলাইয়া দিবা; আমি সাহেব হইয়া আসিলের পর তোমার বিবী হওন চাই [পড়া গেল না] যাওন কালে নৌকার পর মাম্লার কোমর ধরিয়া নাচ [পড়া গেল না] বুরা কর্ত্তারে নমস্কার না করিয়া এই ক্ষণ থাকিয়া হস্ত চালন করিবা। লজ্জা থাকিলে বিবী হওন যায় না, একেবারে বেহায়া হইবা এবং রাস্তার পর ভদ্রলোকে দেখিলেই পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক সমাদর করিবা। আমাদের কুল প্রথা এক কালেই নিন্দার, সে জন্য কুলে কাটা দিয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইবা।

রন্ধনে আর কর্ম্ম দেখি না। ফিরিয়া আসিলের পর বাবুরচি পাক উঠাইবে নামাইবে, খানশামা সে বাটিয়া দিবে। তুমি আমি ছুড়ি কাটা ধরিয়া টেবলে ভক্ষণ করিব। এখনে কেবল মাত্র নবাব সাহেবের ঘরে মধ্যে মধ্যে বেড়ানে যাইয়া মুসলমান অভ্যাস করিবা। আমি যেমন পুরা সাহেব আসিব, তুমিও সেই মত পুরা বিবী হইয়া থাকিতে পারিলে সুখের কারণ হইবে।

আমার কারণ চিন্তা করিবা না। বিবী লোক বিধবা হইলে বিবাহ করিয়া থাকে, তুমিও করিতে পারিবা আমি তাহাতে রাগ করিব না, বরং খুশী হইব।

সকল দিন আমারে পত্র লিখিবা: তাহাতে মাই ডিয়ার করিয়া লিখিবা বাবু করিয়া লিখিলে আমার জাতি থাকন সঙ্কট হইবে। ঠাকুরাণীরে আমার প্রণয় কহিবা এবং এই পত্রের উত্তর মনুমেণ্টের পশ্চিম চাদপালের ঘাট ঠিকানায় লিখেলে আমি পাঠ করিতে করিতে জাহাজের পর ভাসিব, দেশের হতাশে চক্ষুর জলে ভাসিব না।"

"পুনশ্চ নিবেদন, সমাজে যাতায়াত রাখনে অনাবেশ করিবা না।"

কলির শুভঙ্কর।

কদমতলার বংশীধর দত্ত গত জনসংখ্যা উপলক্ষে আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পরিচয় লিখিতেছিলেন। স্ত্রীর বয়স লিখিলেন, কুড়ি বৎসর।

এক জন প্রতিবেশী সেই খানে বসিয়া-ছিলেন। "দত্ত-দা, উপিনের বয়সই যে কুড়ির কাছা কাছি।" উপিন, দত্ত মহাশয়ের পুত্র।

বংশীধর বলিল——"তা হোক ভায়া, কিন্তু স্ত্রীর বয়সে আমার ভুল হ'বার যো নেই। আঠারো বছরে আমার বিয়ে হয়, তখন তাঁর বয়স, ন বচ্ছর। এখন আমার ঠিক চল্লিশ, দেখ্'ছ না?"

নব বিধান।

(ভাবশুদ্ধি ও অনুপ্রাসচ্ছটা)

১। 'ব্রহ্ম মদে মাতিল মুঙ্গের'।

২। ব্রহ্ম গাঁজায় গাঁজিল গাজিপুর।

৩। ব্রহ্ম চরসে চৌরস চট্টগ্রাম।

৪। ব্রহ্ম ফিঙে ফাঁপিল ফতেগড়।

৫। ব্রহ্ম গুলিতে গলিল গারো দেশ।

৬। ব্রহ্ম চণ্ডুতে চেতিল চানক।

৭। ব্রহ্ম ভাঙে ভোর ভাগলপুর।

৮। ব্রহ্ম তামাকে তর হইল তমলুক।

৯। ব্রহ্ম চাটে চকিত চাটমোহর।

পঞ্চা-নন্দ

দ্বিতীয় কাণ্ড।] সন ১২৮৮ সাল [চতুর্থ খণ্ড।

ঠাকুরদাদার কাহিনী।

এক থাকেন রাজা, তিনি খান খাজা, বাস করেন আমড়ার বাগানে। কোটা বালাখানা, বাগ বাগিচা, দীঘী পুষ্করিণী, হাতী ঘোড়া, গাড়ী পাল্কী, লোক লস্কর—এ সব যে কত তা বলিয়া ওঠা যায় না। রাজার ভাণ্ডার, কুবেরের ভাণ্ডার। ফল কথা, ভূভারতে এমন রাজা আর ছিল না।

রাজা বয়সে যেমন নবীন, জ্ঞানে তেমনি প্রবীণ। রাজা হইলেই তার যেমন সুয়া দুয়া দুই রাণী থাকিতেই হয়, এ রাজার তা ছিল না;—এক রাজপাটে এক পাটরাণী। এখন রাজরাণী হওয়া না কি খুব জোর কপালের কথা, তোমার আমার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না, এই ভেবে রাজা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পারিষদ্বর্গ এক দিন বিকাল বেলায় দেখে যে ফুল বাগানের পদ্ম পুকুরের পাথর-বাঁধা ঘাটে ধরাসনে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, বিমর্ষ ভাবে রাজা মৌনী হইয়া রহিয়াছেন।

পারিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পারিষদ, চুপি চুপি পা টিপে টিপে পেছুন দিক দিয়া রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া খপ্ করিয়া দুই হাতে রাজার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। রাজা তখন এক মনে ভাবিতে ছিলেন, আঁৎকে উঠিলেন; পারিষদ তবু চক্ষু ছাড়িল না। কাজে কাজেই রাজাকে পারিষদের হাতে হাত বুলাইয়া দেখিতে হইল, লোকটা কে? হাত বুলান শেষ

করিয়া, একটু রাজ হাসি হাসিয়া রাজা বলিলেন——ঠাওরাইতে পারিলাম না।

তখন সেই হাতের মালিক ফিক্ করিয়া একটু হাসি ছাড়িয়া দিয়া, রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—বলি, মহারাজ, একা বসে এত ভাবনা টা হচ্ছিল কিসের?

চোখ ধরাতে রাজার ভাবনা গিয়াছিল, এই কথায় আবার সেই ভাবনা ফিরিয়া আসিল, রাজা বলিলেন—প্রিয় সখে ভাবি কি সাধে? ভাবনা আসিয়া পড়ে তজ্জন্যই ভাবিতে হয়। পরের দুঃখ ভাবিতেছি।

পারিষদ এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে রাজার বাক্য সকল শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করাইতেছিল, ফুরাইলে পর উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না অপিচ বলিল —মহারাজ সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা আপনি, আপনার আবার ভাবনা? ধনাগারে ফাঁক নাই, হীরা মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ; শরীরে ফাঁক নাই, রূপ যৌবন পরিচ্ছদাদিতে শোভা উছলিয়া পড়িতেছে, গীত বাদ্য মাংস মদ্য সদস্য বয়স্য কিছুরই অভাব নাই। আমি ভাবিতেছে. ভাবনা কোন পথ দিয়া কোথায় প্রবেশ করে? না মহারাজ, আজ অন্য কোন নিগূঢ় কথা আছে, আমাকে বলিবেন না, সেই জন্য এই সকল ওজর করিতেছেন।

পারিষদের এই শ্লেষ সূচক বাক্য পরম্পরা শ্রবণ মাত্র, রাজা অতি মাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া খিন্ন চিত্তে উত্তর করিলেন—প্রিয় বয়স্য, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি আছে? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া অবিচার করিতেছ। সত্য সত্যই আমি পরের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইয়াছি।

উভয়ে মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা একে একে দুঃখ জানাইতে লাগিলেন, পারিষদ যথাক্রমে তাহার প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল।

বিস্তীর্ণ রমণী কুল মধ্যে একজন মাত্র রাজরাণী হইতে পারে, অন্যের সেই সৌভাগ্য সম্ভবে না। ইহাই রাজার এক নম্বর পর দুঃখ।

মীমাংসা অতি সহজ। পারিষদ বলিল——মহারাজ, এ দুঃখের নিবারণ ত আপনারই হস্তে রহিয়াছে। বাক্য এবং ব্যবহারে আপনি ঘোষণা করুন

যে যাহার রাজরাণী হইবার সাধ আছে, আপনি তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন; আপনার পাটরাণীর প্রতি একাগ্রতা পরিত্যাগ করুন; তাহা হইলে সৌভাগ্য-কামিনী রমণী মাত্রকেই রাণী নির্ব্বিশেষে অশন ভূষণ সম্প্রদান করিয়া পরদুঃখ নিরসন এবং আত্ম ভাবনা বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সংশয় দেখি না।

সাধু! বয়স্য, সাধু! বলিয়া মহারাজ প্রিয় বয়স্যের করমর্দ্দন এবং শিরশ্চুম্বন করিলেন। এত সহজে এক চিন্তার পার পাইয়া, আর এক চিন্তার উন্মেষণ করিলেন। বলিলেন——বয়স্য, আমার প্রজাবর্গ অতি দরিদ্র, কোনও প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু তাহাদের চরিত্র বড় দুষিত, গণিকা এবং মদিরাতে তাহাদের ধনক্ষয় হয় এবং তাহারা সপরিবারে কষ্ট পায়; ইহার উপায় কি?

এই দ্বিতীয় দফায় দুঃখও অকিঞ্চিৎকর; পারিষদ প্রস্তাব করিল—মহারাজ, এ জন্য চিন্তা কি? ব্রহ্মাণ্ডের বারবিলাসিনীগণকে আপনি আশ্রয় প্রদান করুন; প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদিগকে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক নিশাশেষে বিদায় করিয়া দিউন; তাহাদের জীবিকা জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিউন; এবং তাহাদের মনোভঙ্গ নিবারণ জন্য রাজপ্রাসাদে সুরাচ্ছত্র সংস্থাপন করিয়া দিউন। মহারাজ, এ প্রকার নিয়ম হইলে শৌণ্ডিকের ব্যবসায় বিলুপ্ত হইবে না, বারাঙ্গণার অবমাননা হইবে না, অথচ নিশাকর ও নিশাচর প্রজাবর্গের ধনবৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইবে, আপনি ধর্ম্মযাজক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন এবং আপনার যশোরাশি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ধরণী মণ্ডলে বিঘোষিত হইতে থাকিবে, বমের শব্দের ন্যায় দূর দূরান্তরে আপনার নামের শব্দ শোনা যাইবে।

তখন রাজার মনে তিন নম্বরের চিন্তা উদ্রিক্ত হইল। যে পণ্ডিত, যে বিদ্বান তাহার সম্মান সকল রাজ্যে সকল রাজাই করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। এমন অবস্থায় মূর্খ বর্ব্বরগণকে ঘৃণা করা, তাহাদের সহবাস বর্জ্জন করা অতি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। বয়স্য, কি বলো?

পারিষদ তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্নের সারোদ্ধার করিয়া দিল। যোড় হস্তে বলিল ——মহারাজ, আমিও ঐ কথা অনেক দিন ধরিয়া মনের মধ্যে তোল পাড় করিয়া আসিতেছি। আমাদিগকে স্থান দিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসার পথ আপনি অনেকটা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তবু এত দিন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে আমার সাহস হয় নাই। আজ যাই আপনি উত্থাপন করিলেন, এখন আর কোর কাপ না রাখিয়াই সব বলিয়া ফেলিব। পণ্ডিত আর ভদ্র বেটারাই এত কাল আদর যত্নের একচেটে করিয়া ছিল; সেই বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে ঐ কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মহারাজ, আপনি যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন——বিদ্যা আর সভ্যতা সুকৃতির ফলেই হয়। সুতরাং মূর্খদিগকে দেবতায় মারিয়াছে বলা উচিত, তাহার উপরে মানুষে মারিলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়। মহারাজ আপনি নিয়ম করুন, যে যার পেটে কালির দাগ আছে, তাহাকে রাজভবনের ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলেই বিধাতার মারের যন্ত্রণাটা আর থাকিবে না; হেসে খেলে সকল লোকেই আপনার জয়জয়কার করিবে। বাস্তবিক মহারাজ লোকের চরিত্রশোধনের যে উপায় করা হইয়াছে, তাহার পর ভদ্রলোককে এদিকে ঘেঁষিতে দিলে, আবার যাকে তাই হ'বে, লাভের মধ্যে স্থানটা ভালো। যে যথার্থ ভদ্রলোক, সে সহজেই এ মুখো হবে না! আর যে নামে ভদ্র, তার সম্বন্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিধান হইলেই সমস্ত নির্ভয় নিঃসংশয়।

রাজা বলিলেন——বয়স্য, সুন্দর কথাই বলিয়াছ। কিন্তু লোকের স্বভাব আমি বিশেষ অবগত নহি, তাই একটা আশঙ্কা হইতেছে, আমার নামে বম্ ফুটিবে ত?

পারিষদ নিবেদন করিল——মহারাজ বলেন কি? বম্ ত বম্ আপনার নামে তোপের শব্দ হইবে, লোকের কাণ ঝালাপালা হইবে, দুষ্ট পড়শীর বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরিবে, চারি দিকে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। মহারাজ আপনি রাজা, শাস্ত্রে বলে——

"মহতী দেবতা রাজা নর রূপেণ তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ কি না রাজা ত মানুষ নয়, দেবতা ; সংসারে কেবল লীলা খেলা করিতেই আসা। তা আমি বুক ঠুঁকিয়া বলিতেছি, আপনার লীলায় কেহ অন্ত পাইবে না।

তার° পর এই নিয়মে রাজা ঘরকন্না কর্ত্তে লাগলেন, অতএব আমার কথাটী ফুরুল, নোটে গাছুটী ইত্যাদি।

আইনের উপদেশ।

ছাত্র। একজন সামান্য বাঙ্গালীও আপনার গলায় আপনি দড়ি দিয়া মরিতে চেষ্টা করিলেও কেন যে তাহার দণ্ড হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

অধ্যাপক। এ আর বুঝিলে না? আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে যে রাজদ্রোহিতার লক্ষণ দেখা যায়, সেই জন্য।

ছাত্র। কিসে?

অধ্যাপক। সকল লোককেই ফাঁসি দিবার অধিকার না কি রাজার, তাই কেহ যদি আপনার গলায় আপনি ফাঁসি দিতে যায়, তাহা হইলে সে স্পষ্টত রাজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, সুতরাং বিদ্রোহী।

শিবপুরের ব্যাপার।

" দোষ কারুর নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

১। ওকালতিতে আর সুখ নাই, দুবেলা দুমুটো অন্ন যোটা ভার হইয়াছে, চাকরির উমেদার এত বেশি যে একটা কর্ম্মের শুধু প্রত্যাশাতেই তিন পুরুষ কাটাইয়া দেওয়া যায়, ঘরে ঘরে ব্যারাম হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসক পায়ে পায়ে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি ভদ্রসন্তান শিবপুরের কালেজ কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ শিখিতে গিয়াছে ; চাকরি যোটে, উত্তম, না যোটে, গতর খাটিয়ে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, ভদ্র সন্তানদের এই আশ্বাস। কিন্তু কপাল এমনি, যে কাজ শিখিতে গিয়া বেচারাদের দুর্গতির আর বাকী রহিল না ; জেলের কয়েদীও খাইতে শুইতে স্থান পায়, কুলী মজুরও উহারই মধ্যে একটু স্বাধীন ভাবে আপনার শরীরের ভাব, মনের গতি বুঝিয়া চলিতে পায়। কিন্তু এই ভাল মানুষের ছেলেদের কষ্টের আর পরিসীমা ছিল না। বাস করিতে হইবে,

তা এমনি ঘর যে "ডিঃ গুপ্ত" সঙ্গে না লইলে প্রবেশ করিবার যো নাই, রাঁধিয়া বাড়িয়া পোড়া পেটে চারটি দিতে হইবে, তা উনন পাতিবার স্থান নাই, কোদাল ধরিয়া অষ্টাঙ্গ ঘামাইয়া একটু খেলা ধূলার জায়গা করিবে, তা সেই দিকেই তার উপর দিয়াই বোম্বাই গাড়ি যাইবার হুকুম হইবে; স্নান পানের জল লইবে, তা ফিরিঙ্গি ছেলেরা ঘাটে নামিতে দিবে না।

বড় কষ্টের সময়েও লোকে অন্যমনস্ক হইয়া একটু আমোদের কাজ করে; পুত্রশোকবিহ্বলা রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে একটী তৃণ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে, সে এক প্রকার আমোদ বৈ কি? শ্রীশ চন্দ্র ভদ্র সন্তান—এ দুঃখের সময়ে আমঃ মনে একটু আমোদ করিতে গেল; কার খানার এক খানা ছেনির কল নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। একে অন্যমনস্ক, তায় কপাল মন্দ, শ্রীশচন্দ্রের হাতে সেই ছেনিটা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফল কি হইল সকলেই জানে। কারখানার ছোট কর্ত্তা কোরেকর্স সাহেব ভদ্রলোকের ছেলের ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্কা-ধাক্কি, বেঞ্চের উপর যষ্টিতাড়না, এক মহা-ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন। মানুষে কত সয় বলো? সমস্ত ভদ্রসন্তান যুটিয়া একপরামর্শ হইয়া শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বে-সর্ব্বা সাহেব বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করিল; কাঁদিয়া জানাইল যে এ অপমান, এত অত্যাচার ভদ্রলোকের প্রাণে কিছু-তেই সহ্য হয় না। কোরেকর্স সাহেবকে না তাড়াইলে ভদ্র সন্তান আর মান লইয়া, আস্ত হাড় রাখিয়া আর তিষ্ঠিতে পারে না।

বাস্তবিক, এত দুঃখ সংসারে কাহারও হয় নাই; ভদ্র সন্তানের উপর এত অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই। দরখাস্ত করা অতি চমৎকার কাজ হইয়াছিল।

* * * * * *

২। ছেলে পিলে পড়িতে আইসে, শিখিতে আইসে। তাহারা যদি বাবু হয়, উন্নত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা হইলে তাহাদেরই পরকাল নষ্ট। শিক্ষার স্থানে পদগৌরব, বংশগৌরব, মান মর্য্যাদার কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে গেলে, শিক্ষা ত হয়ই না, শিক্ষকের পক্ষে আপন মান বাঁচাইয়া চলা ভার হয়।

শিবপুরে যাহারা শিখিতে গিয়াছিল, তাহারা গরবেই অধীর—আমরা ভদ্র সন্তান। আপনি ভদ্র কি না সে দিকে দৃষ্টি নাই, শুধুই ভদ্র সন্তান। তা ভদ্র সন্তান হইলেই কি রান্না ঘরে আঁস্তাকুড় করিতে হয়? সাহেব ফিরিঙ্গির ছেলেরা কি খায়, কেমন শোয়, দিবা রাত্রি তাই ভাবিতে হয়? আর শেখা গেল, পড়া গেল, কেবল তাদের হিংসাই করিতে হয়? তাহার উপর ভদ্র সন্তান হইলেই কি আপন কাজ ফেলিয়া, যেখানে সেখানে গিয়া, কল ভাঙ্গিয়া, জিনিশ পত্র নষ্ট করিয়া অশিষ্টতা, অবাধ্যতা দেখাইতে হয়? শিক্ষার মূল গুরুভক্তি, তা গেল চুলোয়। কেবল বাবুয়ানা হইল না, শিক্ষক কেন রুক্ষ কথা বলিল কিম্বা গায়ে হাত তুলিল, কেবল এই জপ তপ ধ্যান জ্ঞান। এমন ছেলেদের কি বিদ্যা হয়? অত বড় মানুষ, অত ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া গুমর করিতে গেলে এখানে চলে না। এমন অশান্ত দুর্দ্দান্ত ছেলেদের ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত। কোয়েকর্ম সাহেব রীতিমত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং দৃঢ়মতির প্রশংসা করা উচিত।

* * * *

৩। এই কাণ্ডে যদি কাহারও কষ্ট হইয়া থাকে, কি অপমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে একা শ্রীশচন্দ্রেরই হইয়াছিল। কিন্তু সব ছেলে যোট পাট করিয়া—এ শিক্ষক থাকিলে শিখিব না, এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কারখানায় থাকিব না—এ সব কোন্ দেশী কথা? বিদ্যালয় ত গুরুমারা বিদ্যার জন্য হয় নাই। কিসে মান, কিসে অপমান, কি ভালো, কি মন্দ, এই সমস্ত শিখাইবার জন্যই হইয়াছে। ছেলেরা যদি এত লায়েকই হইয়া থাকে, কর্ত্তার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কি কলম চালাইবার অধিকারই যদি তাহাদের জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিদ্যালয়ে কেন? অবশ্য মুনিরও ভ্রম হয়, গুরুরও দোষ হয়, কিন্তু যার ক্ষতি, সেই কেন বিনয় করিয়া দুঃখ প্রকাশ করুক না? সব ক জনে জমাতবস্ত হইয়া বর্গীর দলের মত হাঙ্গাম করা কেন? এ যে বড় কুশিক্ষা, ভয়ানক কুদৃষ্টান্ত। এখন থেকে ষড়যন্ত্র করা

অভ্যাস করিলে কালে এ সকল ছেলে যে কি ভয়ানকই হইয়া উঠিবে, তাহা বলিবার কথা নয়, অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মহামনা ক্রফ্‌ট সাহেব যেমন্‌ সদ্বিবেচক, তেমনি দয়ালু, যেমন দৃঢ় শাসক, তেমনি সুনীতির পোষক। ছেলেদের একবারে দূর করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইলেও, তাহাদিগকে নিজ দোষ দেখিবার সময় দিলেন। আপন আপন ভ্রম বুঝিয়া যৎসামান্য অর্থ দণ্ড দিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এই তাঁহার সদয় ইচ্ছা। ইহাতেও দুর্ম্মতিদের চৈতন্য হইল না। না হইল, ত মরো। শিখিলে নিজের উপকার, না শিখিলে নিজেরই অপকার। শিক্ষা ফলে বড় মানুষ হইয়া কেহ ত অধ্যক্ষ-প্রবরকে সম্পত্তির অংশ দিবে না। সুতরাং ক্রফ্‌ট সাহেবের বিবেচনার গুণবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার দয়াগুণের কথা সহস্র মুখে বর্ণিতব্য!

* * * *

৪। যিনি যাহা বলুন, আমাদের গবর্ণমেণ্টের মত রাজ্যপ্রণালী, এত প্রজানুরাগ, এরূপ সমদর্শিতা বড় একটা সুলভ পদার্থ নহে। রাজ্য-বিপ্লব নয়, শাসন সম্বন্ধীয় কোনও প্রকাণ্ড সমস্যা নয়, এই বিশাল রাজ্য মধ্যে কোথায় এক গুরু মহাশয়ের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ হইয়াছে, বিভাগের কর্ত্তা তাহার একটা যেমন হউক নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এই সামান্য উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের ছোট লাট ইডেন সাহেব মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের একটা সামান্য অংশও স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই, অথচ রাজ্যেশ্বর স্বীয় সর্ব্বতোদর্শন দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কোনও কথা নাই যে, সকল বিষয়েই লাট সাহেবকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, লাট বাহাদুর অমুক প্রসঙ্গে নিজ মত-প্রকাশ করিলেন না বলিয়া কেহ তাঁহার কেশস্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু, তথাপি এই সামান্য বিষয়ের জন্য লাট সাহেবের মাথাব্যথা। তাই যে যা হউক একটা

করিয়া দেওয়া, তাহা নয়। প্রকাশ্য গেজেটে, প্রকাশ্য ভাবে উভয় পক্ষের দোষ গুণের সমালোচনা করিয়া লাট সাহেব যেন সাধারণ প্রজাবর্গ সমীপে নিজের কৈফিয়ৎ দিতে, সাফাই করিতে বসিয়াছেন। কি সাহস! কি সদাশয়তা! কি লোকানুরাগ! কি সার্ব্বজনীনতা! যিনি ইঙ্গিত করিলে মাথার পর মাথা গড়াগড়ি যায়, যিনি নিশ্বাস ফেলিলে ফাঁসির আসামী খালাস পায়, —তাঁহার এই সৌজন্য। এমন সুখের কথা, এত আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? রাম রাজ্যের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা হইলে এই সেই রাম রাজ্য; রাজপদে বসিয়া কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে ইডেন সাহেবের গৌরব অপরিসীম এবং অপরিমেয়।

* * * *

৫। পঞ্চানন্দ দেখাইলেন যে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবিহিত রূপে প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এত হুলস্থূল হইয়া গেল, অথচ কাহারই তিল মাত্র দোষ নাই। তবু যে এত গোলযোগ, এত মনোভঙ্গ, এত দীর্ঘ নিশ্বাস, এত দন্তনিপীড়ন এই এক ব্যাপার লইয়া হইল, সেই জন্য মনের আনন্দে সচ্চিদানন্দ পঞ্চানন্দ বলিতেছেন

" দোষ কারু নয় গো মা,
কেবল স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

* * * *

আইনবাজ হাকিম।

কালাচাঁদ হাকিম বেধড়ক আইনবাজ। প্রমাণ বিষয়ক আইনে ভারি দখল। তিনি আইন সঙ্গত প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দিকে দৃষ্টিপাতই করেন না।

একটী মামলায় বাদীর বয়স প্রমাণ জন্য তাহার মাতা সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিত।

উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন " তুমি বাদীর কে হয়।"

সাক্ষী। "আমি বাদীর গর্ভধারিণী মা।"

উকীল। " বাদীর বয়স কত জান?"

উকীলের প্রশ্ন বন্ধ করিয়া হাকিম সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন " তুমি বাদীর জন্ম সময় সাক্ষাৎ ছিলে?"

উকীলকে স্বীকার করিতে হইল যে ও সওয়ালটা না করা ভুল হইয়াছে।

দুষ্টের দমন বিধি।

[ফৌজদারি কার্য্যবিধির প্রস্তাবিত সংশোধনে পর্য্যাপ্ত প্রতীকার হইবে না বিবেচনায় পঞ্চানন্দের পাণ্ডুলিপি]

আইন হইবার কথা।

যে হেতু নানা রকম চেষ্টা করিয়াও ইংরেজ বাহাদুর দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর দমন ও শাসন করিয়া উঠিতে অক্ষম হওয়ায়, অপরাধের বিচার প্রণালী সংশোধন না করিলে, রাজত্ব অচল এবং প্রজাত্ব প্রবল হইতেছে, এমতে নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

অনুষ্ঠান, রদ, ব্যাপ্তি এবং পরিভাষার কথা।

১ দফা। সংক্ষেপ নামের কথা:

এই আইন দফা রফার আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তির কথা।

এ আইন যেখানে চলিবে না, সেখানেও নিতান্ত অরাজক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আরম্ভের কথা।

এবং এ আইন জারি হইবার পূর্ব্বেই চলিতে থাকিবে।

২ দফা। রদের কথা।

যে সকল আইন এবং বিধান হাকিমানের মনোমত নহে বা হইবে না, তাহা একক্কারা রদ করা গেল।

৩ দফা। দায়ের মোকদ্দমার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা দায়ের আছে, তাহার নিষ্পত্তি এই আইন মর্ত্তে হইবে।

৪ দফা। পরিভাষার কথা।

এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ এবং ভাষার নিম্নলিখিত মত অর্থ হইবে, অন্যথা হইবে না।

তদারকের কথা।

লোককে ধরিয়া চালান দিবার জন্য পুলিশ যে কোনও কার্য্য করিবে, তাহার নাম তদারক। তদারক শব্দে হাতকড়ি দেওয়াও বুঝাইবে।

বিচারের কথা।

লোককে সাজা দিবার জন্য আদালতে যে সকল অনুবন্ধ হইবে, তাহার নাম বিচার। বিচার শব্দে খালাস বুঝাইবে না।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

জজ, মেজেষ্টর প্রভৃতি যে কেহ সাজা দিবে, আদালত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

হাইকোর্টের কথা।

যে আদালতে আসামীর উকীল, কৌঁসুলি চড়টা, চাপড়টা অভাবে মুখ থাবড়া খাইবে, হাইকোর্ট শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

৫ দফা। আদালতের রকমারির কথা।

হাইকোর্ট ছাড়া, আরও দুই প্রকার আদালত থাকিবে, যথা।

(ক) মেজেষ্টরি।

(খ) সেশন।

৬ দফা। যে আদালতে বিচার হইবে তাহার কথা।

মেজেষ্টর ইচ্ছা করিলে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। মেজেষ্টরের অপ্রবৃত্তি বা আলস্য হইলে, কোনও কোনও মোকদ্দমার বিচার সেশনে হইতে পারিবে।

গৌরাঙ্গের মোকদ্দমার কথা।

৭ দফা। গৌরাঙ্গের কথা।

গৌরাঙ্গ শব্দে নেটিব নহে, এরূপ কোট পেণ্টুলানপরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে। এরূপ ব্যক্তির উপরের সাত পুরুষ এবং নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেহ কস্মিন কালে সমুদ্র না দেখিয়া থাকিলেও তাহারা সকলেই গৌরাঙ্গ হইবে।

৮ দফা। গৌরাঙ্গের মোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা।

স্বয়ং গৌরাঙ্গ না হইলে কেহ গৌরাঙ্গের মোকদ্দমা করিতে পারিবে না।

৯ দফা। গৌরাঙ্গ তলব করিবার কথা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ করিলে গৌরাঙ্গের নামে তদ্যোচিত নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মরা কি অক্ষম হওয়া কি অন্য কোনও ওজর করিয়া কোনও ব্যক্তি প্রতিনিধি স্বরূপে গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে না, এবং তদ্রূপ অভিযোগ গ্রাহ্য বা তম্মূলে নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইবে না।

১০ দফা। গৌরাঙ্গের বিচারের কথা।

গৌরাঙ্গের অনভিপ্রায়ে কেহ তাহাকে সাজা দিতে পারিবে না।

পুলিশের কথা।

১১ দফা। পুলিশকে সাহায্য করিবার কথা।

মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্ম, অর্থ, লোকবল এবং বাহুবল দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলিশের সাহায্য করিতে বাধ্য, যথা,

(ক) শান্তি ভঙ্গ করণ বিষয়ে।

(খ) একরার এবং চোরামাল বাহির করা বিষয়ে।

(গ) সাধারণত তদারক বিষয়ে।

১২ দফা। বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।

পুলিশ যেখানে খুশি, যাকে খুশি, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।

১৩ দফা। গৃহ প্রবেশের কথা।

আসামী থাকা জানিতে পারিলে, কিম্বা থাকা সন্দেহ হইলে, কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা থাকিলেও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান হইলে, কিম্বা যদিই ভুল ভ্রান্তি ক্রমে থাকিয়া যায়, এরূপ বোধ হইলে ঘর ভাঙ্গিতে, দুয়ার ভাঙ্গিতে, জানালা ভাঙ্গিতে,

আসবাব ভাঙ্গিতে, মান ভাঙ্গিতে, সম্ভ্রম ভাঙ্গিতে, বৈঠকখানায়, সেঁৎখানায়, ঠাকুর ঘরে কিম্বা অন্দরে অবারিত দ্বারে প্রবেশ করিতে পুলিশ ইচ্ছামত পারিবে।

১৪ দফা। অন্দরের বিশেষ কথা।

অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাড়ীর এবং পাড়ার বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষবর্গকে হাতকড়ি দিয়া, কিম্বা অন্য প্রকারে বন্ধন করিয়া পাহারায় পুলিশ রাখিতে পারিবে, এবং আবশ্যক বোধ করিলে জোর পূর্ব্বক কুলকামিনীকে বাহির করিতে পারিবে।

১৫ দফা। তদারকের কথা।

তদারক করিবার সময়ে পুলিশ শ্যামচাঁদের সাহায্যে আসামীকে একরার করাইতে এবং চোরা মালের কিনারা করিতে পারিবে।

১৬ দফা। পুলিশের তদারকি কাগজের কথা।

তদারকের প্রণালী সম্বন্ধে পুলিশ কোনও কথা লিখিয়া রাখিতে পারিবে না; এবং লিখিয়া রাখিলেও তাহা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

বিচারের পূর্ব্বানুষ্ঠানের কথা।

১৭ দফা। উকীল মোক্তারের কথা।

আদালতের অনুমতি ব্যতীত আসামী উকীল মোক্তার দিতে বা দিবার প্রসঙ্গ উত্থা করিতে পারিবে না। তদ্রূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাহা অপরাধ স্বীকারের তুল্য গণ্য হইবে।

১৮ দফা। উকীল মোক্তারের অধিকারের কথা।

কোনও উকীল মোক্তার আসামীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর জেরা কিম্বা সওয়াল জবাব করিতে পারিবে না। হাকিমানের অনুমতি লইয়া সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে।

মেজেষ্টরের বিচারের কথা।

১৯ দফা। ধরাধরি বিচারের কথা।

মেজেষ্টরের ইচ্ছা হইলে ধীরে সুস্থে, লিখিত পঠিত পূর্ব্বক ধরাধরি বিচার হইতে পারিবে।

২০ দফা। সরাসরি বিচারের কথা।

ঘোঁড়দৌড় করিতে করিতে কিম্বা পথে ঘাটে বেড়াইতে বেড়াইতে তাড়াতাড়ি করিয়া বিনা লেখা পড়ায় মেজেষ্টর স্বেচ্ছাক্রমে আসামীর সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

সেশনে বিচারের কথা।

২১ দফা। জুরিও আসেসরের কথা।

সেশনে প্রত্যেক মোকদ্দমায় জুরি অথবা আসেসরের সাহায্যে আসামীর বিচার হইবে।

জুরি হইলে, অন্যূন তিন জন এবং আসেসর অন্যূন এক জন নির্ব্বাচিত হইবে।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, বাহিরের মুটে মজুর, ঘোঁড়ার গাড়ীর কোচমান কিম্বা গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে জুরি অথবা আসেসর মনোনীত হইতে পারিবে। তাহাতেও

মিত সংখ্যা পুর্ণ না হইলে, বলদ ধরিয়া বসান চলিবে।

২২ দফা। আসেসর ও জুরির সাহায্যে বিচারের কথা।

জুরি অথবা আসেসরের সহিত একমত হইয়া সেশনের হাকিম আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন। জুরি অথবা আসেসর বা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ আসামীকে নির্দ্দোষ প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পুর্ব্বক সেশনের হাকিম একাএক আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন।

আপীলের কথা।

২৩ দফা। আসামীর আপীলের কথা।

সরাসরি ভিন্ন ধরাধরি এবং সেশনের বিচারের অসম্মতিতে আসামী আপীল করিতে পারিবে।

২৪ দফা। আসামীর আপীলের ফলের কথা।

আসামী আপীল করিলে জরিমানার স্থলে মেয়াদ এবং মেয়াদের স্থলে ফাঁসি এবং সকল স্থলেই সাজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

২৫ দফা। সরকারের আপীলের কথা।

আসামীর প্রতি অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস পাইলে সরকার হইতে আসামীর মৃত্যুর পুর্ব্বে যে সময়ে হউক আপীল হইতে পারিবে।

২৬ দফা। সরকারের আপীলের ফলের কথা।

সরকারের আপীলে, আসামীর সাজা হইতে পারিবে এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইতে পারিবে, এবং আসামীর আপীলের যে ফল তাহাও ফলিতে পারিবে।

হাইকোর্টের কথা।

২৭ দফা। পুনরালোচনার কথা।

অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস হইলে হাইকোর্ট খোদ এক্তেয়ারে অথবা পরের কথায় সমস্ত মোকদ্দমার নথি তলব দিয়া দেখিতে পারিবেন, এবং খালাস দিলে অরাজক হইতে পারে বলিয়া সুবিচার করিতে পারিবেন।

সরকারের কথা।

২৮ দফা। আইন স্থগিত করিবার কথা।

এই আইনের বিধান মতে কার্য্য হইলেও দুষ্টের যথোচিত শাসন হইতেছে না, এমত বোধ করিলে সরকার বাহাদুর কিছু কাল বা চিরকালের জন্য আইন স্থগিত করিতে পারিবেন।

২৯ দফা। আইন স্থগিত হইলে উচিত কথা।

তদ্রূপ আইন স্থগিত করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ পুর্ব্বক দেশবাসীগণকে আঙ্গিয়া পরাইয়া সরকার বাহাদুর তৈল নিষ্পেষণে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

গোরাচাঁদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠক পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্ত্তারই হাতে।

তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহর, তাহাও এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; এত যে জনস্রোত, তাহাও যেন শুখাইয়া, শীর্ণ হইয়া, সঙ্কুচিত হইয়া বালুকারাশি মধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেষু,—জনস্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এস্থলে বালুকারাশি যে কোন্ পদার্থের উপমান তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথায়ও একখানা ভাড়াটে গাড়ী ভয় দেখাইবার জন্য বিকট শব্দ সহকারে মৃতপ্রায় অশ্বযুগলের অনুধাবন করিতেছে; অশ্বদ্বয়ও প্রাণের দায়ে একমনে একভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভূতকে বড় ভয় করে; রাত্রি কালে সন্দিগ্ধ স্থল দিয়া যাইতে হইলে ভয়ে দৌড়িতে পারে না, থামিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার অবস্থাও সেই রূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া আঁধারিয়া লাণ্ঠান হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা দুইটী পরম তত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; এক, সার্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর, একটা চোর কিম্বা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়। যাহারা পাখা টানে, আর যাহারা পাহারা দেয়, তাহারা ইহকাল পরকাল এক সঙ্গে রক্ষা করে,—ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাজ ভোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিন্তু দোতলার উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি হইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় শব্দে নেশায় তর্ র্ কলিকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা ঘুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বসি নাই, পটও আঁকিব না। গোরাচাঁদনা কি সভাস্থল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই ঐতিহাসিক নবাখ্যানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিতেছি। আপনারা যেটা ভুলিবেন না।

তত রাত্রিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং প্রবেশ করিবার উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতাশ্বাস হইয়া এই খানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরাচাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহন্য, সঙ্কল্প অটল, সাহস দুর্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু গোরাচাঁদের অভীষ্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জ্বল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা ধৃষ্টতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

স্ত্রী উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ী গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভাতলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভার এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব, বক্তৃতা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক, বিতণ্ডা—কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মসীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিখামন্দির যদি লেখনী হইত, ভূমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার এই রজনীর কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা যায় না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনও মতেই নয়। আপনারা এই স্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন; উপরে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরূপ নহিলে হয় না। ফল কথা, আমি সে কার্য্য বিবরণ এখানে তুলিতে সাহসী হইলাম না; সদ্য সদ্য তাহা না পড়িলে যাঁহার সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাদপত্রে পাঠ করিতে পারিবেন।

স্ত্রীপুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্য গোরাচাঁদ যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন:

যথাবিধি গোরাচাঁদের সে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার পুস্তকে লিখিত আকারে পরিণত হইল, এ টুকু বলা আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, জয়ের পূর্ব্বে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরাচাঁদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাঁহার বিরোধ চেষ্টা করিয়া কেহ যে নিজ দুর্ব্বলতা, অসমসাহিকতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে। অন্ততঃ এখন, এখানে না বলিলে চলে।

সেই জয়ে উল্লসিত হইয়া, সভাভঙ্গের পর দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত করিয়া গোরাচাঁদ কর্ণবালিস রথ্যা অবলম্বনে বাটী যাইতেছিলেন। তাহাতে সুকিয়ার গলির মোড়ের সম্মুখে গ্রন্থকারের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আবার এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিয়াছি; তন্মধ্যে এক কথা এই যে মির্জাপুর রথ্যার কোনও এক স্থানে স্ত্রী উত্তোলনীয় কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই ধড়াচূড়াবান্ধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ী ধাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে গাড়ী ভাড়ার পয়সা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোরাচাঁদ একাকী পদব্রজে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, গোরাচাঁদ গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিতাম না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্প, এরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যগণ উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গোরাচাঁদ বিরাট পুরুষ, উন্মত্ত হইলেন না; তাই বলিয়া অন্তরের তরঙ্গ বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য্য নহে, ভূকম্পে ভূধরও টলিয়া যায়। সুতরাং গোরাচাঁদ চলিতে চলিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গী সমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বামকরতলে দক্ষিণ

করমুষ্টি সশব্দে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এক পার্শ্ববর্ত্তী পাদপন্থা হইতে অপর দিকের পাদপন্থায়, আবার এধার হইতে ওধার,—বারবার গোরাচাঁদ এ প্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাও আমি অস্বীকার করি না, অস্থির মতিতে পদ বিক্ষেপ অস্থির ইহাছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য্য, সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সভার নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না, সহজেই পুরুষত্ব লাভে সম্মত হইবে, সমগ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা চাপিয়া রাখিবার আনন্দ নহে। এখন, এই গৌরবের কথা, এই আনন্দের কথা দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই "বঙ্গ-মশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, গোরচাঁদ ইতস্তত করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে সর্পগতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; কাজে কাজেই মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গ মশালের" বাড়ী যাই, অমনি রাস্তার ডান ধারে উপস্থিত; আবার মনে করেন, "বঙ্গ মশাল" হয় ত এত ক্ষণ ঘুমাইয়াছে, অমনি দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপাইয়া চিন্তা; তখনি স্থির করেন আত্মগৌরব পরমুখে ব্যক্ত হইলেই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁধারে আসিয়া পড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়, তখন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, দুপা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখানকার সেই খানে পা থাকিতে দেহ-প্রতিমা দুই বার বামে, দুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলত গোরাচাঁদের সেই আপাত দৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গ মশাল"।

"বঙ্গ মশাল" যে বঙ্গ দেশীয় বঙ্গভাষা বিরচিত, বঙ্গোন্নতির কেন্দ্রীভূত "জগদ্বিখ্যাত" সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, এ কথা যে না জানে, মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাদুরের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়াই উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গ মশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে——বৃথা কথা। আমি বলি না——রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। এক জন পাহারাওয়ালা একটা আলোক স্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত নয়নে ভাবনা করিতে ছিল যে ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজী বড় উত্ত্যক্ত করিতেন, যশোদা মাইর খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন হুঁসিয়ার পাহারাওয়ালাও সে আমলে ছিল না। এখন এই'কম্পনীর'মুলুকে আমার সাম্নে পড়িলে কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটী তুলিতেন, অমনি আাম খপ্ করিয়া —ভগবৎ ধ্যান মগ্ন পাহারাওয়ালা সত্য সত্যই দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে, দৈবের বিচিত্র সমাবেশ, গোরাচাঁদের দেহখানি সেই হাতখানির প্রান্ত-দেশে উপস্থিত! সুতরাং সংস্পর্শ ; ফল, উভয়েরই ধ্যান ভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে বড় বড় দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই, সুতরাং কিষণজী ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে "শ্বশুরা" বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব। কিন্তু বলিল——"শ্বশুরা"। গোরাচাঁদও "বঙ্গ মশাল" ভাবিতে ছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ক্যা হ্যায়"। চিত্তবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি, শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোলযোগের উৎপত্তি। এ কি না নৈসর্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য্য হইল। পাহারাওয়ালা পূর্ব্বে কেবল শ্বশুরা বলিয়াছিল, এখন বলিল—"শ্বশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগত্যা গোরাচাঁদের মুখে "যও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইল উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহারাওয়ালা। ক্রমে রীতিমত নরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ——"পাকড়ো চোর—মাতোয়ারা" ইত্যাদ।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! নিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড়! সাহস নাই এমন নয়,—এত রাত্রিতে সভা সঙ্গ হু

সভা হইতে একাকীপ্রত্যাগমন,ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমন নয়,—'জরের উচ্ছিষ্ট প্লীহাগর্ভ বঙ্গবাসী সহজে এত বেগবান হইতে পারে না, তবু দৌড়! ভ্রম বশত দৌড়। পাহারাওয়ালা দৌড়িতেছে, সেও ভ্রমবশত দৌড়। সংসারে কয়জন ফিরিয়া দেখে? সংসারের গতিকই এই।

ইহাঁরা দৌড়ুন কিন্তু পাঠকপাঠিকা এখন নিতন্তাই গ্রন্থকারের হাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি, রাখিলে রাখিতে পারি; এখন একমাত্র আমার দয়ার উপরে নির্ভর। এই জন্যই গ্রন্থকারের এত সম্মান, লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্য নিত্য দেখিতে পাও না, দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের কর-কবলিত হইয়া কত সুশীল সুবোধ পাঠক শেষে কান্দিয়াও নিস্তার পান না? অতি কোমল শয্যায় সবলে শোয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থিভঙ্গের সম্ভাবনা, এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভালবাসার ধন, নায়িকাকেও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া এই কেলি, এই কেলি করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন; বহু অশ্রুপাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর দুঃখ ভুঞ্জাইয়া আশার সুখ প্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া বীর ধীর শান্ত নায়ককেও গ্রন্থকার ভদ্রাসনের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগর তলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্র লোকের মত সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থকারদের এই রীতি। এক্তেয়ার আছে বলিয়াই এই কার্দ্দানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনন্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পাহারাওয়ালা তাড়িত হইয়া দৌড়িতে পারেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে কবলিত হইতে পারেন; অথবা বিপদপ্রশান্ত মহাসাগরে সন্তরণ লীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অতর্কিতে বেলাভূমিতে পদার্পণ করিয়া হাস্য রাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন। পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত? সেই জন্যই বলিয়াছি পাঠক পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থ কর্ত্তারই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একবার 'বিশ্রাম লভিব; আপনারা ভাবিতে থাকুন।

সমালোচন।

"মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধির" ২২শে শ্রাবণের খণ্ড এক জন "পঞ্চানন্দ পাঠক" কর্তৃক "সমালোচনার্থে প্রেরিত হইয়াছে। "প্রতিনিধি" একটু বিদ্রূপিত হউন" পাঠকের" এই রূপ ইচ্ছা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমালোচনা ন্যায়ানুগত হউক কি না হউক, বিদ্রূপ করিয়া 'পাঠকের" ইচ্ছা তৃপ্ত করা যাইতেছে; কারণ, পাঠক পরিতুষ্ট করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। "প্রতিনিধির" অবস্থা দেখিয়া চক্ষে জল আসে। তা, বঙ্গদেশের প্রতিনিধি কি না, এই রূপ হইবারই তো কথা।

২। যে "ধনসিন্ধু" যন্ত্রে প্রতিনিধির মুদ্রা গুণ সংযোজিত হয়, তাহাতে সকল প্রকার ছাপার কাজ "অল্প মূল্যে ও সুচারুরূপে" সম্পন্ন হয় বলিয়া একটা বিজ্ঞাপন আছে। প্রতিনিধির বার্ষিক মুল্য গরিব লোকের পক্ষে বেশি বলিয়াই বোধহয়, কিন্তু "ধনসিন্ধুর" পক্ষে কখনই বেশি বলা যায় না। অতএব "প্রতিনিধি" গরিবের নহেন। তা গরিবের কেহই নাই, "প্রতিনিধি"ই বা থাকিবে কেন?

৩। "প্রতিনিধি" দুঃখ করিয়াছেন "সাধারণের ঐক্যতা নাই।" পঞ্চানন্দের মতে "ঐক্যতা" না থাকাই ভালো; থাকিলে ব্যাকরণ বিশারদ পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিরোধ হইবার আশঙ্কা। বিরোধ বাঞ্ছনীয় নহে।

৪। "প্রতিনিধি"র আর এক দুঃখ এই যে "সাধারণের শান্তি নাই"। কথাটা ঠিক নহে। হিন্দুর পূজা পর্ব্বে শান্তি, কেশব বাবুর নব বিধানে শান্তি, আর সকল ব্রাহ্ম-সমাজেই শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ—শান্তি নাই কোথায়? ইহাতেও শান্তি ভঙ্গের সম্ভবনা হইলে শান্তি রক্ষক পুলিশ আছে। বাস্তবিক শান্তি নাই বলিলে রাজদ্রোহিতা, ধর্ম্ম দ্রোহিতা দুই পাপে পাপী হইতে হয়। "প্রতিনিধি" এ পাপ করিবার ভার কাহার নিকট পাইয়াছেন?

৫। "প্রতিনিধি" এক হাকিমের ঔষধ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার কতক গুলি ঔষধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে "এই সমস্ত ফকীরি ঔষধি ঈশ্বর কৃপায় উপকার করিবেক"। বাকী সমস্ত, কাহার কৃপায়? তিন রকমে সংসার নির্ব্বাহের গল্প আছে। কোনও দিন ঈশ্বর চালাইয়া দেন—অর্থাৎ খোরাক যুটিলে; কোনও দিন বাবা চালান—ধারে সংস্থান করিয়া ঋণ পরিশোধ না করায় বাপান্ত খাইতে হয়; আর কোনও দিন বা নিজে চালাইয়া লইতে হয়—উপবাস করিয়া। "প্রতিনিধির" হকিমজীর ঔষধ ঈশ্বর কৃপায় ত উপকার করিবেক, অন্য দুই উপায়ে করিবেক না কি?

এই পাঁচ কথায় পঞ্চানন্দ ঠাট্টা করিলেন; ইহাতেও যদি পাঠকের পরিতৃপ্তি না হয়, তবে নাচার।

পাঞ্চা-নন্দ

দ্বিতীয় কাণ্ড] সন ১২৮৮ সাল। পঞ্চম খণ্ড]

লেজ! লেজ!! লেজ!!!

অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতি কারিকরের তৈয়ারি এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরস, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ষ্টভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা আপনি, তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ, এমন সময়ে মোক্তার আপন কার্দ্দানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন্ ভিন্ করিয়া তোমার স্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। থামাও তাহাকে, লেজের এক বাড়ি মারিয়া।

লও লেজ, ভালো উকীলের বিশেষ দরকারি। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাসে বসিয়া উত্তর পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথা মুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যে টুকু বুদ্ধিশুদ্ধি গোড়ায় ছিল, তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে, শেষে আপিল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে পারিতেছি না; প্রকাশ্যভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তোমার আত্মগরিমায় জখম লাগে, বাজে লোকের কাছে তুমি অপদস্থ হও। একটি লেজ থাকিলে কোনও ভয় থাকিবে না, সময় শিরে লেজ টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পথভ্রম হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি সুবোধ হও, বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপনার যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও। লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি ময়লাফেলা কমিশনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন যোগানো, আর পাড়াপড়শীকে ভোগানো তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাহেবের হাতে যদি তোমার লেজটি দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি তুমি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটি লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি; কত সভা সমিতিতে, কত দরবারে তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক জায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর, বাজেলোকের গোলে কখনও তুমি মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগ্মীপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটী লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বর পুত্র, তুমি কথায় কথায় ঝড় বাহিয়া দাও, বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এত দিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড় ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধার বার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশ্বাসপাত্র, তোমাকে একটী লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই, তাহা জানি, তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, তত সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো, তোমার কতদিকে কত টান, কিন্তু সাহেব সুবার টানেই তোমার লেজ-মালা দিবানিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা পৃথক লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার বায় পাইতে পারি। তাই বলিতেছি, শুণধাম একটী লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের ষোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটী লেজ লও।

নগদ মূল্যে লইলে এক একটী রস্তা দস্তুরি দেওয়া যাইবে।

পেনাদার এণ্ড কোম্পানি।

[বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।]

পঞ্চানন্দ।

পুনশ্চ নিবেদন।—পঞ্চানন্দের ছাপাওয়ালা বোধ হয় অত্যন্ত অলস এবং অমনোযোগী, আর বোধ হয়, সে পঞ্চানন্দের চক্ষের উপর কাজ করে না। এই বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যে প্রচারিত হইতেছে, সেই কৃতজ্ঞতায় ছাপাওয়ালাকে একটী লেজ আমরা বিনা মূল্যে দিতেছি; ইহাতে উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে।

পঞ্চানন্দের একটা অবলম্বন হইবে, আর ছাপাওয়ালারও লেজের মমতায় একটুকু ভয় থাকিবে।

পেসাদার এণ্ড কোং।

মন্ত্রগুরু ও শয্যাগুরু—বড় কে?

(সুলভ সমাচারে খুব সদ্ভাব পূর্ণ গল্প থাকে। নমুনার জন্য ১০ই পৌষের সুলভ হইতে একটা গল্পের চুম্বক দেওয়া যাইতেছে)

হরিদয়াল মাড়য়ারীর গুরু একটু গ্রন্থ বাঁধিবার কাপড়ের জন্য লালায়িত। মাড়য়ারীর গোটা থান, ছিঁড়িয়া গুরুর সম্মান রক্ষা করা তাহার সাধ্যাতীত। গুরু টানাটানি করিয়া দেখিলেন কিন্তু কিছুতেই ছিঁড়িয়া দিতে হরিদয়ালের মতি হইল না। মাড়য়ারিনী তিথি অতিথি বুঝিয়া দান ধ্যান করিয়া থাকে, অদ্য মাসকাবার; মাড়য়ারিনী সেই সময়ে একটু ন্যাকড়ার জন্য দোকানে আসিয়া উপস্থিত। হরিদয়াল কথাটী না কহিয়া ঘাড় হেট করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া দিল।

ধরণীর ধরণ; ঢাকার আমদানি।

১। জগন্নাথকে খয়রাৎ।

আফীমখোর্‌রা বিশেষ ক্ষীর দুগ্ধ প্রিয়। মজুমদার মহাশয় আফিমখোর এবং স্ত্রী পুত্র বিহীন। মজুমদারের গুরু বৈশাখ মাসে আসিয়া পরমান্ন প্রসাদ দ্বারা শিষ্যকে বিশেষ তুষ্ট করেন। পুনরায় ভাদ্র মাসে আসিলে শিষ্য বলিল "সেবার যেমন পরমান্ন প্রসাদ দিয়াছিলেন, এবারও তদ্রূপ দিতে হইবেক।" গুরুর উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পয়সা—তবে এবার অন্য অনেক শিষ্যের বাড়ী যাইবার আবশ্যকতা থাকায় এবং বহুক্ষণ ধরিয়া পরমান্নে জ্বাল দেওয়া বিরক্তিকর জানিয়া বলিলেন, "বাপু! বড় দুঃখিত হলাম গত রথযাত্রায় শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রভুকে পরমান্ন দিয়া আসিয়াছি।" শিষ্য মাতায় হাত দিয়া "প্রভু করেছেন কি? এত জিনিস্ থাকে জগন্নাথকে পরমান্ন দিলেন" প্রভু বলিলেন "নাচার! কিন্তু যাতে পারি তোমার মন তুষ্ট করিব।" পরে গুরুজী স্বহস্তে পাকাদি করিয়া ভোজনে বসিলে মজুমদার ব্যজন হস্তে সম্মুখে বসিয়া মাছি তাড়া

ইতে লাগিলেন। গুরু ব্যঞ্জনাদি শেষ করিয়া শেষে ঘন দুধে ভাত ও চিনি দিয়া দিব্য করিয়া মুখে দিতে আরম্ভ করিলে মজুমাদার ব্যজন ফেলিয়া যোড়হস্তে বলিলেন "প্রভু! তবে কি জগন্নাথকে কেবল মুড়োর জালটী দিয়ে এসেছেন"।

২। সুরেশ্বরীর কৃপার জমীর অভাব নাই।

শশী ঘোষের পিতা চন্দ্রশেখর ঘোষ বাসন্তী পূজা আনিয়া স্বীয় পল্লীর অতি প্রধান ব্যক্তি কৃষ্ণ বসুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রতিবাসী ঘনশ্যাম দাসের সঙ্গে কৃষ্ণ বাবুর বাটীতে গেলেন। কৃষ্ণ বাবু বড় লোক বটে কিন্তু মাতাল। প্রাতে মদ খাইয়া আপন বৈটকখানার মেজের উপর গড়াইতেছিলেন, হঠাৎ সবান্ধবে শশী ঘোষের পিতা উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "কি ঘোষজা খবর কি?" ঘোষজা বলিলেন "মা আসবেন আপনাকে তিন দিন যেতে হবে" কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "যাত্রা না দিলে আমি যাব না।" ঘোষজার বাড়ী ছোট এবং উঠান অতি সঙ্কীর্ণ, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "আজ্ঞা যাত্রা দিতে পারি, কিন্তু জায়গা কোথায়"? কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "তুমি যাত্রা দিও, আমি জমি নিয়ে যাব" ঘোষজা অবাক, বলিলেন "আপনি জমি নিয়ে যাবেন"! ঘনশ্যামের কৃষ্ণ বাবুর বাড়ী গতাগতি ছিল এবং বাবুর বিশেষ পরিচিত। ঘোষজার কথার উত্তরে বলিলেন "বাবুর জমির অভাব কি—বাবুতো জমি নিয়েই আছেন।"

৩। বয়াটে বয়।

ফরাসডাঙ্গায় গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা করিতেছিলেন। গান, মানভঞ্জনের। কৃষ্ণকে রাধিকার পায়ে ধরিতে সম্মত করিবার জন্য স্বয়ং দূতী গোবিন্দ অধিকারী বলিলেন যে বয়, তার খোসবয়—আর যে যে না বয় সে নাবোয়। আমাদের হরি গোসাঞী বিশেষ বাচাল এবং একটু রসিক, পুস্তক বগলে লইয়া হুগলি কালেজে আইন পড়িতে যাইতেছিলেন। অনেক বেলা পর্য্যন্ত যাত্রা হওয়ায় একবার শুনিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। অধিকারী মহাশয়ের কথা শেষ হইলেই একটু অগ্রসর হইয়া অধিকারীকে লক্ষ্য ও কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "আর যে বই বয় সে অতি গুড বয়।"

৪। দশা-হারার গান।

১২৮৮ সাল্ গত ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ দশহারার দিবসে জনৈক ভিক্ষুক, বিড়ালদহের ব্রহ্মগুদামের দরজায় বসে নিম্নলিখিত গানটী গাইয়াছিল।

রামপ্রসাদী সুর।

এখন কেন পেছিয়ে এলে।
তোমায় বলেছিলাম সেই সে কালে॥
ধর্ম্মের হাট বাজার খুঁজে, কিছু কি ভাই নূতন পেলে; তার হদ্দ করে গেছে মোদের, বৃদ্ধ মুনি ঋষিদলে॥

ত্যজে সুরধুনী গঙ্গা, জর্ডনে আশ্রয় নিলে; শেষে পুকুরেতে ডুবিয়ে মাথা, ধর্ম্মবায়ুর বেগ থামালে॥

দেশী কৃষ্ণ নদের চাঁদে, দ্বেষ করে জিসায় ধরিলে; এখন কেশ মুড়ায়ে গেরুয়া পরে, হতে চাও মা শচীর ছেলে॥

হিন্দুর যত অনুষ্ঠান, তখন হেয়-জ্ঞান করিলে; এবে ব্রহ্মচারী শুদ্ধাহারী, শান্তি খোঁজো শান্তি জলে॥

এ দিক্ ও দিক্, ছুটোছুটি, করে বৃথা কাল কাটালে; সেই খুয়ে মল, তবে কেবল, বুদ্ধির ভ্রমে, লোক হাঁসালে॥

তবুও ভাল বদ্দির্ ছেলে, এদ্দিনে যে রোগ টের পেলে; ঘরে থাক্তে নিদান, নব বিধান, কর্ত্তে গেলে টাউন হলে॥

দীন বলে ভ্রান্তিহুলি, নাকের চসমা দাও ভাই ফেলে; আছে আশা মনে, তোমার সনে, আস্‌বে ফিরে ভেড়ার পালে॥

আমি কে, আর আমি কার?

(বেকার লোকের লেখা।)

এই প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিয়াছেন। যে হেতু মৌন সম্মতি লক্ষণ; আমি উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। বিল্ববৃক্ষ বিহারী মহাপুরুষ ব্রহ্মদৈত্যেরা দৈত্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখেই প্রকট হইয়া থাকেন কিন্তু অদ্য স্বয়ং মহাপুরুষই কথা কহিতেছেন। আমি কার? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই; আমি সকলকার। আমার মনে বিকার নাই, তাই কেহ২ আমাকে নির্ব্বিকার বলেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন গোকুল বিহারীর মত আমি সখী সখা পিতা মাতা সকলকার। আমি সখা, সখী-

দারের দ্বারী ভ্রাতা, কোকিল বিহারীর হস্তের ছড়ি, কন্যা রাজনারীর পরম হিত-কারী এবং কোমল কুটিরবাসিনী গৃহিণীর জীবন বারি। আমি কাঙ্গাল এবং ধনীর, মুর্খ এবং জ্ঞানীর। আমার চক্ষে শ্বেত কালো সমান, শিক্ষাশির ব্রাহ্মণ এবং শ্মশ্রু-অধর মুসলমান আমার উভয় তুল্য। কি উচ্চ কুচরাজ, কি আমা পুকুরের ব্রহ্ম মন্দিরের মস্তক, কি কলমীর কুটিরের প্রাচীর, আর কি ঘানি টোলার গাছ ঘর, আমার চক্ষে ইতর বিশেষ শূন্য। বিশুদ্ধ শ্বেত স্ফটিক রচিত নয়নাবরণ মধ্য দিয়া আমি সকলি বিশুদ্ধ, সকলি শ্বেত নির্ম্মল দেখিয়া থাকি।

আমি কে? আমি কে? আমি সব। আমি চন্দ্র আমি পাপ বৈদ্য। আমি ধর্ম্মধ্বজী—ধর্ম্ম যুদ্ধে সেনা নায়ক, আমি মহাসেন। আমি নিদানে—আমি মোক্ষ মুক্তি প্রদানে; কেবল কন্যা সম্প্রদানে, শালগ্রাম দেখিয়া এক্ষণে নববিধানে প্রবৃত্ত হই য়াছি।

আমি সুন্দরকার গৌরাঙ্গ। বঙ্গে কত রঙ্গ করিলাম তাহার সীমা নাই। আমি যোগীর চক্ষে সন্ন্যাসী—সহধর্ম্মিনীর অগ্রে রাস রসিক এবং জামাতার অগ্রে রাজ সচিব। আমায় সকলে এক চক্ষে দেখে না। ভাবুক ভেদে আমার অনেক রূপ। কেহ আমাকে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মত চতুর মনে করেন। যার চিত্ত নদীয়ার শ্রীবাসের তুল্য প্রশস্ত, তিনি আমাকে অধমতারণ জ্ঞান করেন। কথাই আছে "মতি কি মন" জগতী তলে যত মাথা তত মত—কাজেই আমার সম্বন্ধে নানাবিধ কথা উঠিয়া থাকে। কিন্তু আমি আগে যেই, আমি পরেও সেই, আমি কিছু আর এই নয়। আমি মন্দিরে, মসজীদে, ময়দানে এবং লোকের মনে। আমি খোল করতালে, খঞ্জনী এবং হার-মোনিয়ামে। আমি আর কত বলিব, আমিই কলিকাতায়, আমিই শিমলায়, আমিই মুঙ্গেরে, আমিই গাজিপুরে, আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বগামী এবং ছেলে বুড়ো সক-লের অন্তর্যামী।

কলিকাতার সিঁদুরে পটী আমার আদ্য লীলার স্থল। শ্বেতাঙ্গ ধাম সুদূর সিন্ধু পার তামস তীরে আমার মধ্য লীলা হয়। আর শেষ লীলা এই ক্ষণ শিবদহ সন্নিকট ললিত গৃহে।

আমার প্রথম লীলার পারিষদ দেব দ্বারকা নাথ সুত দেবেন্দ্র দেব। দ্বিতীয় লীলার পারিষদ অনেক; দেশী এবং বিদেশী—তন্মধ্যে সাহেব জনসারই অতি প্রধান ছিলেন। আর এই শেষ লীলায় ত্রৈলোক্য সুদ্ধ অনেক বয়স্য এবং শিষ্য।

পূর্ব্বে আমি বক্তা হইয়া বায়ু দ্বারা জীবের ধর্ম্মায়ুর মঙ্গল সাধিতাম। এক্ষণে বায়ু ছাড়িয়া অন্যতর ভূত, জলের আশ্রয় লইয়া তদ্দ্বারাই শান্তির কার্য্য সাধন করিতেছি। মস্তকই কুলকুণ্ডলিনীর বাস স্থল, তাই লোকের মস্তকে জল সেচনা আরম্ভ করিয়াছি; আর যেমন চিকিৎসকেরা এলোপেথি ছাড়িয়া হমোপেথী এবং হাইড্রোপেথী ধরিয়াছে আমিও তেমনি আত্মার রোগ সম্বন্ধে জলসেক, জল পড়া অবলম্বন করিয়াছি। জাহাজে ইংরেজ এসে গঙ্গাজলকে অপবিত্র করায়, আমি আমার পবিত্র কুটীরের পুষ্করিণীর জলের আশ্রয় লইয়াছি। দেখা যাগ এই ধর্ম্ম হাইড্রোপেথিতে কত দূর কার্য্য হয়।

—

চিঠির মুসবিদা।

[সে কেলে উকীলদের একটা খ্যাতি ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে যে তাঁহারা মুসবিদা করিতে অদ্বিতীয়। হাল ধরণের উকীলগণ হাত পা নাড়িতে ভাল, নজীর দেখাইতে ভাল কিন্তু বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত; মুসবিদার ত তাঁহারা যম।

পঞ্চানন্দ সেকেলে। অগত্যা যাবদীয় সংবাদপত্র ও প্রবন্ধপত্রের সম্পাদকবর্গের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া, অনেক দিন ধরিয়া একখানি পত্রের মুসবিদা করিতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কিছু কাল তদীয় দরজা রুদ্ধ ছিল, তোমরা তাঁহার শ্রীচরণ-রাজি সন্দর্শন করিতে পাও নাই।

পত্রখানি এখন প্রস্তুত। প্রত্যেক পত্র-সম্পাদক সমীপে প্রেরণ করিতে হইলে বহু ব্যয়, বিলম্ব এবং বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। তাই, নিম্নে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। আবশ্যক অংশ সম্পূর্ণ করিলেই কাজে লাগিবে।]

মহামহিম মহিমার্ণব

শ্রীলশ্রীযুক্ত (নাম, এবং পুচ্ছ থাকিলে পুচ্ছের পরিচয় বসাইতে হইবে) মহোদয়

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন

বরাবরেষু।

সযোড়হস্ত সকাতর সবিনয় নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। পরং মহাশয়ের মহারাজোন্নতি (অথবা রাজোন্নতি, রায়োন্নতি, বাহাদুরোন্নতি, অভাবে বাবুন্নতি, যেখানে যেমন বসাইতে হয়) নিরত শ্রীশ্রীগবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে এ দেশের, এবং এ দাসের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল জানিবেন।

মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাহাতে বীণাপাণি বাগ্‌দেবী নিতান্ত উপকৃত এবং চিরচরিতার্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। যে হেতু ভবদীয় লেখা পড়া শিক্ষা শুদ্ধ বদান্যতা মাত্র।

কাজে কাজেই মহোদয়ের নামের জ্যোতিঃ ভূমণ্ডলের উত্তর মহাকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ মহাকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, দেশের তমোরাশি অপসৃত হইয়াছে। এখন সূর্য্যদেব থাকিলেও চলে, না থাকিলেও চলে।

আপনার গুণানুবাদ করি, এত শক্তি আমার নাই। আপনার সম্বন্ধে অত্যুক্তি অসম্ভব। বানরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছে।

বিলাস ভোগই আপনার উপযুক্ত কার্য্য। তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন দেখিয়া ভবদীয় শ্রীঅক্ষর সংযুক্ত পত্র (প্রাপ্তে বা অপ্রাপ্তে) মূঢ়বুদ্ধি অসমসাহসী স্বার্থান্ধ আমি সাহস বাঁধিয়া (বঙ্গদর্শন বা বান্ধব, সাধারণী বা সঞ্জীবনী এইখানে বসাইবে) লইয়া মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছি। আপনার অসীম কৃপা, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সেই জন্য আপনি আমাকে সার্দ্ধচন্দ্রে বিতাড়িত করেন নাই; অপিচ কখনও কখনও অতি সুদুর্লভ অবসর পাইলে মোড়ক খুলিয়া, মলাট তুলিয়া অভ্যন্তরে শুভ দৃষ্টি পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এ আনন্দ প্রকাশ করি কাহার কাছে? এ গৌরব বোঝে কে?

ফলে আপনি এবম্প্রকারে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া শত মুখেও ব্যক্ত করা যায় না। এই সঙ্গে যদি আর একটু উপকার করেন —লুব্ধের আশার না কি সীমা নাই, তাই বলিতেছি—আরও একটু উপকার যদি করেন, তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহে

ঋণ সাগরে আমি একেবারে তলাইয়া যাইতে পারি।

পাপিষ্ঠ কাগজ বিক্রেতা অত্যন্ত অর্থলোভী; মহাশয়ের মন যোগাইবার অভিপ্রায়ে, সেই কাগজে ভবদীয় গুণ গরিমার বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের নিকট কাগজ লইয়া থাকি। কিন্তু এমন মহাব্রতের গৌরব তাহারা বোঝে না, তাহারা সর্ব্বদা পেটের দায়েই অস্থির, হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তোলে; তাহাতে একমনে মহোদয়ের গুণ চিন্তনের ব্যাঘাত হয়। বিধর্ম্মী পাষণ্ড দপ্তরি কাটিয়া ছাঁটিয়া, বান্ধিয়া যুড়িয়া ভবদীয় অনুগ্রহ লাভে জন্ম সার্থক না করিয়া বেতন চায়। মহাশয়েরই পদ সেবার জন্য শোষক রাজা ডাক হরকরাগিরি ব্রতাবলম্বন করিয়াছে অথচ টিকেট বিক্রয় হলে শোষকতা ছাড়িবে না। আর, ক্ষমা করিলে বলিয়া ফেলি, উদর নামে আমার যে এক শত্রু আছে সেও মহাশয়ের কাজে বাধা দিয়া থাকে। বক্তৃতা করিয়া হউক, সভা করিয়া হউক, বিলাতে ভগ্নদূত পাঠাইয়া হউক কিম্বা "পারিলে সন্দে" দরখাস্ত করিয়াই হউক, যে কোনও প্রকারে এই দুষ্ট সম্প্রদায়ের শাসন যদি করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মহানুভবের নিকট "বিনি মূলে" চিরবিক্রীত হইয়া থাকি।

বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতেছি এই অন্যায় অন্তরায়গুলি না থাকিলে আমার (অমুক) পত্র প্রকাশ করিতে তিলমাত্র নিয়ম ব্যত্যয় হয় না; এবং আপনার অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ এবং স্বদেশ বাৎসল্য অপ্রতিহতভাবে লীলা করিতে পাইয়া জগৎ সংসারকে তোলপাড় করিয়া তুলিতে পারে।

বক্তৃতা, সভা ইত্যাদি বিষয়ে যদি আপনার নিতান্তই অমত হয়, তাহা হইলে ভদ্র লোকের মত দামটা ফেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। তাহাতে আমার ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তা প্রকাশ পাইবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনার দোষ কি? না হয় মনে করিবেন, এ কাগজখানাও সাহেব চালিত ইংরেজী কাগজ, অথবা এ টাকা কয়টা সাহেব চাহিত সৎকর্ম্মের চাঁদা, কিম্বা শুঁড়ীর খাতার দেনা কিম্বা ইত্যাদি। আপনার "ইত্যাদি" অনন্ত,

আমি কি তত্ত্ব জানি, না প্রকাশ করিতেই পারি !

মহাশয়ের কুশলেই এখানকার কুশল। অধিক লিপি বাহুল্য। নিবেদন ইতি।

দাসখৎ

(নাম বসাও)

অধ্যক্ষ (বা কার্য্য নির্ব্বাহক)

পরিমাণের দোষে পরিণাম নষ্ট।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, বিস্তর লোক জমিয়া গিয়াছে, তাহার পাশে হিরালাল বাবুও একটু মদ-বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

ভাবযুক্ত হইয়া গায়ক গাইতেছে—

"কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায় রে।"

শুনিয়াই হিরালালের প্রাণ চটিয়া গেল, "দূঃশালা, শেনো। তাইতে এত লোকের জটলা, বটে ?" বলিয়া হিরালাল সরিয়া পড়িল।

নদীয়ায় অঞ্জনা নন্দনের * চেষ্টা।

নদীয়া জেলা জ্বরে জ্বরে খাক হইয়া গেল। এখন জ্বরের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কমিশ্যন বসিয়াছে। লোক অজস্র মরিতেছে, কমিশ্যনরেরা কারণের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কেবল এ বেলা ও বেলা অঞ্জনার কাছে যাইতেছেন, আর "হেই মা কি হবে, ওমা কি করিব" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

পঞ্চানন্দের বিশ্বাস যে, এ জ্বর বায়ুর কোপে নহে, তবে অমন তর করিলে কি ফল হইবে ? তবু দেখা ভাল, অঞ্জনার রাগ পড়িলেও যদি উপকার হয়।

* আফ্রিকার ভূবিবরণ যাঁহারা উত্তমরূপ জানেন, তাঁহাদের উপকারার্থে জানান যাইতেছে যে অঞ্জনার প্রবাহ রোধই নদীয়ার জ্বরের একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে।

পঞ্চানন্দের পত্রিত্র।

মুড়ি।

(বৈজ্ঞানিক কাব্য—সটীক।)

মুড়ি বঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য"—বিধবা বিবাহ।

(প্রথম স্তবক।)

ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি আসি এই বঙ্গভূমি
উদ্ধারিছ বঙ্গবাসী গণ।
কাঙ্গাল বিষয়ী যত, সদা তব অনুগত,
কভু হর ইংরেজের মন॥ (১)

কিবা রূপ বিমোহন শুভ্রকান্তি সুগঠন,
Prima facie (২) রসহীন দেহ।
সত্য কি বঞ্চিত রসে? যে রস হৃদয়ে বসে,
জানে কি রসিক বিনা কেহ?

রস নাই তার কাছে, রসনাই যার আছে,
নাহি মুখে দন্ত এক তোলা।
খেতে হলে আধ সের, যার পক্ষে হয়ে শের, (৩)
রক্তারক্তি করো দুই বেলা॥

শব্দ শুনে মুড় মুড়ো, ভয়ে কাঁপি যত বুড়ো,
পলাইয়া যায় দূর দেশে।
শেষে তার আশা তরি, (বটপত্রে যথা হরি),
উদ্ধারহ নিজে জলে ভেসে॥

গুঁড়ো হয়ে গুড় সনে, তরিবারে ভক্তস্থনে,
তুমি প্রভু নিজ রূপ ত্যাগী।
রম্ভাতে মিলিলে মুড়ি, রম্ভা আদি স্বর্গ ছাড়ি,
লালায়িতা তব প্রেম লাগি॥

সুদ্ধ মুড়ি দুগ্ধ সনে, "আচারে" আনন্দ আনে,
ছাতু পেলে কর কত রঙ্গ।
করে'দয়া পরকাশ, পুরাও বুড়োর আশ,
বাদলে বাদল কর ভঙ্গ॥

কি কব মাহাত্ম্য তব, আপনি নিদানে শিব,
করেছেন এ কথা লিখন।
তোমার গা-ধোয়া জলে, রোগীর বিকার হলে,
হিক্কা আদি করে নিবারণ॥

তন্ত্রের মধ্যম সূক্তে, সুশ্রুতের অতিরিক্তে,
ঋষিগণ ক'রেছে লিখন।
অম্বলে আক্রান্ত রোগী, একপক্ষ মুড়ি সেবি,
"অম্বলের" করেছে দমন॥

---

(১) বেলগাছিয়ার বাগানে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ মুড়ি খাইয়া ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।——সুলভ সমাচার।

(২) প্রাইমা ফেসী (লাটিন ভাষার কথা) অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে।

(৩) সিংহ।

সংসারে মহৎ যেই, গরিব নওয়াজ সেই,
মুড়ি দেখ দীনদুঃখ হরে।
গর্ব্ববন্ধু মুড়ি তুমি, তবগুণে রাঢ়ভূমি,
বাধ্য সদা অশেষ প্রকারে॥

ধনী বাবু বলে মুখে, মুড়ি খেলে পেট রোখে,
তাই তারা বিস্কুটেতে মজে।
বিস্কুটেতে রুচি গেলে, বাবু নাকি ছলে কলে,
খেতে চান মুড়ি, সব ত্যজে॥

(দ্বিতীয় স্তবক)

পূর্ণ কোরস্।

আহা!
শশা সনে হলে যোগ, অমৃতে আদিত্য ভোগ,
আদায় সদাই তব প্রেম।
মুড়িভোজী পেলে লঙ্কা, স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা,
শঙ্কা করে সদা তারে যম॥
মুড়ীতে মুড়কী রেখে, ষড়রস তত্ত্ব শিখে, (৪)
সদাযোগে কত সুখ, হায়!

খর্জ্জুর গুড়ের সনে, যে খেয়েছে সেই জানে,
নিখেকো কোথায় মজা পায়?

চিপিটকে নারিকেলে, তাহে মধুযুক্ত হলে,
হর্ষে রোগী অর্শমুক্ত হয়।
মুড়িতে রাখিলে মণ্ডা, তপ্তপ্রাণ হয় ঠাণ্ডা,
মুর্গীর আণ্ডার পরাজয়॥

৺ গুপ্তের জ্যান্ত শিষ্য।

[ভক্তগণ দেখিয়া যাইবে, পঞ্চানন্দের কাছে মুড়ি মিছুরি এক দর]

ছেলে ভুলানো উত্তর।

কনু (যাহার মামা বিলাতে পাস দিয়া আসিয়াছে)——হাঁ বাবা, মামা অত করে, রাত দিন মুখে সাবান মাখে কেন? আগে ত এ সব করত্ না।

কনুর বাপ।——হাবা ছেলে, এও জানিস্ নে: তা নইলে "উদ্ধারের" কলঙ্ক যাবে কিসে?

---

(৪) পল্লীগ্রামের দোকানদার মহাশয় দিগের বৃহদাকার ভাণ্ডমধ্যে মুড়ি মুড়কীর সহিত বৃক্ষ পত্র, বিহঙ্গমাস্থি, মৃত মক্ষিকা, ছিন্নবস্ত্রাংশ, কাষ্ঠখণ্ড, কাগজ, তিন্তিড়ীবীজ, পাওয়া যায়।

খবর্!

'খোশ খবরের ঝুটোও ভাল'।

—বগুড়ায় একটী স্ত্রীলোকের পুত্র মরিয়া যায়, সে কাঁদিবার জন্য পাসের দরখাস্ত করে। শান্তিভঙ্গের ভয়ে শার্প সাহেব তাহা দেন নাই; গরিব বেচারা কাঁদিতে পাইল না বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পঞ্চানন্দ এ সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

—শোনা যাইতেছে বর্দ্ধমান জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ফিলিপ্‌স্ সাহেব অত্যন্ত আইন জানেন বলিয়া বড় লাটের বড় সভার বড় আইনজ্ঞ ষ্টোক্‌স্ সাহেবের চাকরি পাইয়াছেন। কথাটা সত্য হইলে বর্দ্ধমানের লোক আনন্দে জয়ধ্বনি করিবে, কিন্তু পঞ্চানন্দ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে ঐ জনরব অমূলক।

— ইদানী আর সাধারণীতে বড় একটা সরস লেখার আভাস পাওয়া যায় না। এখন প্রগল্‌ভতার পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্য দেখা যাইতেছে। এই রূপ হইবারই কথা, কারণ, তপস্যার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সাধারণী পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণে যান না কেন?

—শুনা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজেরা এ দেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। সংবাদ সত্য হইলে অতিশয় দুঃখের বিষয়; কেন না তখন আমরা বক্তৃতা করিলে বুঝিবে কে, আর মেমোরিয়েল লিখিলেই বা পড়িবে কে?

—হিন্দুদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হুগলীর কয়েক জন উকীল ও জমীদার গোরাদের গোরু খাওয়া বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাঁদের স্বজাতিবাৎসল্য প্রশংসার যোগ্য; কারণ, জাতি রক্ষার উপায় করাই স্বজাতিবাৎসল্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

—যাঁহারা সর্ব্বদা বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া মদ খাইয়া থাকেন, তাঁহারা খোলাভাটীর প্রতিবাদ করিতেছেন। পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে এরূপ স্বার্থপরতা নিন্দনীয়, এবং বোধ হয় যে ভা-

রতবাসীদের এই প্রকার মতদ্বৈধ দেখিয়াই সরকার বাহাদুর কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না। বাস্তবিক, খোলা হউক, বন্ধ হউক যাহাতে যাহার সুবিধা সে সেই পথ অনুসরণ করিবে। ইহাতে আপত্তি করিলে ঘরে ঘরে বিবাদ হয় মাত্র। শাস্ত্র বলে, "যেন তেন প্রকারেণ ভজকৃষ্ণপদাম্বুজং"। কাজ নিয়েই কথা।

—বর্দ্ধমানের কমিশ্যনর বীমস্ সাহেব হুগলীর বাঙ্গালীদের বিরস বিরক্তিকর বাচালতা বর্দ্দাস্ত করিতে পারেন না; সেই নিমিত্ত খোলাভাটীর পোষকতা করিয়া লাটসাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যেনো কেনো যাই হউক, 'A good glass of grog" পাইলে গলা একটু সরস হইবেই হইবে। বীমস্ সাহেব আর আমার একরায়।

—ডিঃ গুপ্তের প্রসিদ্ধ ঔষধের উপকার লাভের প্রত্যাশা করিলে "জীবিত মৎস্যের ঝোল" খাওয়া আবশ্যক। কয়েক জন পুরাতন রোগী "জীবিত মৎস্যের ঝোলের" ভয়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে না পারিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় মৎস্যকে আগে যথেষ্ট পরিমাণে ডিঃ গুপ্ত খাওয়াইয়া শেষে তাহার ঝোল রাঁধিলে "জীবিত" থাকিতে পারে। অন্তত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

প্রাপ্ত পত্র।

শাস্ত্রঘটিত প্রশ্ন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

আপনি বা আপনার অযুত সংখ্যক পাঠকবৃন্দ মধ্যে কেহ নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে অনুগৃহীত হইব।

সীতা উদ্ধারের বার্ত্তা আনিবার জন্য হনুমান সাগর ডিঙ্গাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি মুখপোড়া হইয়া আসেন, একথা রামায়ণে আছে।

কিন্তু পোসাক বদলাইয়া এবং দেশীয় আচার ব্যবহার বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন কি না, বঙ্গীয় কোনও রামায়ণেই ইহার সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমার কতিপয় বন্ধু এই কথা লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন এবং হালের নজীর অনেক দেখাইতেছেন।

দুঃখের বিষয় আমি নজীর মানি না, শাস্ত্র মানি। সেই নিমিত্ত দায়গ্রস্ত হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতেছি।

বশম্বদ

শ্রী———

(রামচন্দ্রের কল্যাণে আমাদের অনেক শত্রু; রামদাসের উৎপাতে আমরা ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। সমকালীনতার বলে বলীয়ান, অথবা সূত্র অবলম্বনে নজীরের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম কোন পাঠক বা লেখক যদি উত্তর লিখিয়া পাঠান আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করিব।———পঞ্চানন্দ।)

একটা প্রস্তাব।

নববিধান নামক কাগজে লেখা হই-য়াছে যে "আমিই আমাকে চিনিতে পারিলাম না, অন্যে কেমন করিয়া চিনিবে। বাস্তবিক আমি পাগল।" নববিধান কেশব বাবুর খাশ কাগজ।

এই কবুল জবাবের পর আর কথা চলে না; এত দিনে সকলে বুঝিতে পারিল যে এত হেঙ্গাম হুজ্জুতের হেতুটা কি? যাই হউক, এখন পুলিশের প্রলোভনে কিম্বা মারের চোটে একরার হইয়াছে, কেশব বাবু এ কথা না বলিয়া বসেন।

বঙ্গদেশে পঞ্চানন্দ এক প্রকার পাগলামি! অতঃপর কেশব বাবু যদি পঞ্চানন্দে লিপি সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাগলামি করা চলে, নামও জাহির হয়; এদিকে খবরের কাগজগুলা রক্ষা পায়, দেশের লোক ঠাণ্ডা হইতে পারে, আর পঞ্চানন্দেরও উপকার হয়।

প্রস্তাবটা কি মন্দ?

সমালোচন।

পঞ্চানন্দ, রস প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন। বর্দ্ধমান। সন ১২৮৮ সাল।

অনেক দিন পরে পঞ্চানন্দের দেখা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এ প্রকার পত্র বঙ্গদেশে আর নাই, ভারতবর্ষে আর নাই, পৃথিবীর কুত্রাপি আর নাই, সাহস করিয়া ইহা বলিতে পারা যায়। বাস্তবিক পঞ্চানন্দ আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন পঞ্চানন্দ বিলুপ্ত হইবে, আমরাও সেই দিন অবধি এ মুখ আর দেখাইব না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে এটা পক্ষপাতের কথা; পক্ষপাত হইতে পারে, কিন্তু সে ভালোর ভালোবাসার পক্ষপাত, অজ্ঞানকৃত পক্ষপাত, আত্মগৌরব জনিত স্বপক্ষে পক্ষপাত। যাঁহারা এ কথার পোষকতা চাহেন, তাঁহারা হর্বর্ট স্পেন্সরের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

ভাষার জন্য কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে পঞ্চানন্দই পারেন। অতি সরল, কোমল, ললিত কথায় পঞ্চানন্দ মনের কথা প্রকাশ করেন, অথচ যেন ইক্ষুদণ্ড, যেন সছোবড় ঝুনো নারিকেল,—কাহার সাধ্য যে দন্তস্ফুট করে! কিন্তু পারিলে, রসে শাঁসে বিলক্ষণ; চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সমস্তই বিদ্যমান। কি গদ্যাঘাত, কি পদ্যস্রাব. পঞ্চানন্দের কিছুতেই কাহারও কথাটী কহিবার যোটী নাই। পঞ্চানন্দ সত্য সত্যই রস প্রধান।

পঞ্চানন্দ অসাময়িক পত্র। ইহা অতি সুব্যবস্থার পরিচায়ক। যাহা সাময়িক অর্থাৎ periodical তাহা কুইনাইনের আয়ত্ত; জ্বর সাময়িক, সেই জন্য জ্বর কুইনাইনের আয়ত্ত। সাময়িক পদার্থ মাত্রেই হয় অনিষ্টকর, যেমন জ্বরাদি, নচেৎ নূতনত্বহীন, যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি। সাময়িকের আর এক দোষ আছে, অসময়ে কোনও উপকার করে না। যখন লেখকের অভাবে, ছাপকের অভাবে, পাঠকের অভাবে, দাম-দায়কের অভাবে তোমার সাময়িক পত্র হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে; লোক সমক্ষে বাহির হইতেছে না, তখন সাম-

য়িক পত্র তোমার কি উপকার করিতে পারে? উপকার দূরে আস্তাং, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, তোমার লীলা সাঙ্গ, তোমার নাস্তানাবুদ করিয়া সাময়িক সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব সাময়িককে বিশ্বাস করিও না। কিন্তু পুর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চানন্দ অসাময়িক, যখন সংসার আর শ্মশানে এক ভাব, যখন সমাজ সমালোচনে আর গোচারণের মাঠে সেই এক অক্ষয়, অব্যয় মূর্ত্তি সাধারণীকৃত বলিয়া উপলব্ধ হয়, ফল কথা, যখন তোমার নিতান্ত অসময়, তখনই পঞ্চানন্দ। অসময়ের বন্ধুই বন্ধু; কে বলিবে, কোন পামর ইচ্ছা করিবে যে পঞ্চানন্দ সাময়িক হউক? যে করে, তাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই। তা ছাড়া সাময়িক পত্রই ত সব গুলা; অসাময়িকেরই নিতান্ত অভাব। পঞ্চানন্দ সে অভাব পূরণ করিয়াছেন।

আরও এক কথা বলা আবশ্যক। পঞ্চানন্দ শাস্ত্রার্থদর্শী, সেই জন্য অসাময়িক, শাস্ত্রকারেরা কলির এই কএকটী গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কলিতে—— (ক) অন্নগত প্রাণ, (খ) জঠরাগ্নি উগ্র (গ) ব্যাধিমন্দির শরীর (ঘ) রোগ-শোক—পরীতাপ—বন্ধন—ব্যসন—সঙ্কুল জীবন (ঙ) সহায় হীনের দুর্গতি, (চ) লোক সকল পাপমতি (ছ) ন্যায্য গণ্ডা ফেলিয়া দিতে সাধারণের মনে হয় ক্ষতি। এই সাত পদার্থ সময়ের 'কোদণ্ড' অর্থাৎ "ষড়রিপু"*। এত গুলি এড়াইয়া কি সময়ের মান রাখা সম্ভব?

অনেক কথা বলা গেল, আরও বিস্তর বলা যাইতে পারে, কিন্তু পাঠকবৃন্দের বুদ্ধিকে খোরাক দিবার জন্য আর একটী মাত্র কথার উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

সমালোচনে পঞ্চানন্দ অদ্বিতীয়; উচিত কথা উচিত মত বলিতে পঞ্চানন্দ কখনই সঙ্কুচিত হন না। ষোলো আনার জায়গায় বরং আঠারো আনা—কম কিছুতেই না। অধিক কি, পঞ্চানন্দ আপনাকেই ছাড়েন না। আপনার নিন্দা না করিয়া যে কেবল প্রশংসাই করেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তিনি যে নাছোড়বন্দা, তাহাতেই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

* "ষড়রিপু হোলো কোদণ্ড স্বরূপ"।

——দাশুরায়

২। সদানন্দ, বিদ্রূপ পত্র ও সমালোচন। শ্রীহরিহর নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এখানি ঢাকাই কাগজ; আসল কি নকল বলিতে পারি না। মুখপাতের উপর ছাপা আছে,

"সাধিতে দেশের হিত কর সবে পণ,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

আমরা ইহার কিছুতেই নাই। দেশের হিত করা অসাধ্য; পণ করিলে প্রমাদ ঘটে; সাধিলেই কি আর না সাধিলেই কি মন্ত্রে কাহারও আস্থা নাই, মন্ত্র কেহ লয় না; আর, শরীর পতনে রাজি নই, কারণ আত্মহত্যার উদ্যম করিলে রাজদ্বারে দণ্ড হয়।

সদানন্দে ঢাকাই বিদ্রূপ থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য; খুব পাৎলা, গায়ে ঠেকে না, যদি ঠেকে তো বেমালুম। আমাদের মোটা চামড়া, আমরা টেরই পাই না। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে যত গুলি সদানন্দ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সব গুলির বিদ্রূপ একটা গুজরাটী এলাচের খোলার ভিতর ধরিতে পারে। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।

রীতিমত চালাইতে পারিলে, লেখক বা লেখকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক, যত্ন করিয়া আগা গোড়া বুঝিয়া সুঝিয়া সরস ভাবে লিখিতে পারিলে, সদানন্দ যে অতি উৎকৃষ্ট, অতি উপাদেয় পদার্থ হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রসিকরাজ, হাস্যোদ্দীপক, বিদ্রূপাত্মক, সচিত্র, মাসিক পরিদর্শক ও সমালোচক। কলিকাতা, শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সালের শুভ বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরব্ধ হইয়া হাত নাগাইদ চারি খণ্ড মাত্র অত্র এজলাশে পেশ হইয়াছে। এজলাশ বন্ধ থাকা গতিকেই হউক, অথবা বৎসরের মাস হ্রাস প্রযুক্তই হউক, এই বর্ষান্তেও আমরা বর্ষাকালীন খণ্ডেই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। অহো কি আনন্দ! ফলত, একটা কথার অকাট্য প্রমাণ ইহাতে পাওয়া গিয়াছে,—বঙ্গীয় সঙ্কল্প সংখ্যার সহিত বঙ্গীয় উদ্‌যাপন সংখ্যার যে অনুপাত, তাহা বিপর্য্যস্ত। (যিনি গণিত শাস্ত্রের পারদর্শন করেন নাই, তাঁহার এই সমালোচন বুঝিবার চেষ্টা করা পণ্ড শ্রম মাত্র)।

রসিকরাজ সহজ ব্যাপার নয়। শরীরের যেমন ছয় রিপু, গানের যেমন

ছয় রাগ, বৎসরের যেমন ছয় ঋতু, বেদের যেমন ছয় অঙ্গ, রসনার যেমন ছয় রস, দুর্গের যেমন ছয় প্রকার, কার্ত্তিকের যেমন ছয় মুখ, রসিকরাজেরও তেমনি ছয় গুণ! রসিকরাজ, কার্ত্তিক আর কি!

প্রথম পরো, হাস্যোদ্দীপক। লোক হাসাইয়া জীবন ধারণ করা অল্প সাহসের কর্ম্ম নয়। অমিততেজা রসিকরাজ আপনি হাসে না, কেবল উদ্দীপন করে।

তাহার পর, বিদ্রূপাত্মক। অর্থাৎ কি না বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা যাহার, স্বার্থে ক। বুঝিতে হইবে যে যেমনই হউক রসিকরাজের একটা আত্মা আছে, সুতরাং পরকালের ভয় ভরসা আছে। অতএব আমাদের প্রথম উপদেশ এই যে পরকাল যেন নষ্ট না হয়। আর কথা এই যে ইহ কালে বিদ্রূপ মনোমত সামগ্রী হইলেও, লওয়া অপেক্ষা দেওয়া ভালো। রসিকরাজ যে বিদ্রূপ লন নাই, ইহা বলিতে পারিলাম না, এই দুঃখ। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিছু বলিব না; যে রসিক, সে ইঙ্গিতে কথা বোঝে। আমাদের ইনি—রসিকরাজ।

রসিকরাজের ঠাট্টা বড় কঠোর। এক এক খান পাথুরে ছবি দিয়া তাহাকে "চিত্র" বলিয়া বাঙ্গালী কারিকরকে অত কঠিন ব্যঙ্গ করা উচিত কি না, রসিকরাজই কেন বুঝিয়া দেখুন না। ময়লায় ঢিল মারিলে ছিটকিয়া গায়ে লাগে। যাহা হউক, সত্য গোপন করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিব না; রসিকরাজের "কন্যাদায়ে" পঞ্চানন্দ খুশি হইয়াছেন।

বলিলেই অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু তাহাতে কাগজ যায়, কালি যায়, কলম যায়, সময় যায়, হয় ত আখেরে মান যায়। সেই জন্য রসিকরাজের জায় ধরিয়া আর অধিক জায় বেজায় বুলিব না।

আশীর্ব্বাদ করি রসিকরাজ ধনে পুত্রে বাড়িতে থাকুন, এবং রসিকতা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে সুখে রাখুন। যদি আমাদের লীলা সম্বরণ কালে রসিকরাজ বাঁচিয়া থাকেন, আর আমরা যৌবন রাখিয়া সরিতে পারি, তাহা হইলে উইলে ব্যবস্থা করিয়া যাইব, তিনি যেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

—:০:—

পঞ্চা-নন্দ

দ্বিতীয় কাণ্ড | ষষ্ঠ খণ্ড।

শোকশেল।

হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! এত ভরসা, এত আশা, সমস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল! আর আমরা কি লইয়া জীবন ধারণ করিব? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব? দুঃখময় সংসারে একমাত্র প্রদীপ, দুস্তর সাগরে এক মাত্র ভেলা, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের এক মাত্র গৃহলক্ষ্মী——কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল? মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থা, ওরফে আদরের ধন ন আইন কোথায় গেল? হায়! আমাদের আর কেহই নাই! কিছুই নাই! (১। দীর্ঘ নিশ্বাস)।

আমরা দেশী লোক, দেশী ভাষায় দেশী কথা লিখিয়া আর কি করিব? আমরা লিখি, বাবুরা পড়েন না; আমরা পরামর্শ দি, বাবুরা কাণে তোলেন না; আমরা উত্তেজন করি, বাবুরা জল ঢালিয়া দেন; আমরা কত মিষ্ট কথা বলি, বাবুরা তুষ্ট হন না; আমরা গালাগালি দি, বাবুরা ভ্রূক্ষেপ করেন না; আমরা কাগজ পাঠাইয়া দি, বাবুরা দাম দেন না। আমাদের আদর নাই, মান নাই, মর্য্যাদা নাই, সম্ভ্রম নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই—কিছুই নাই। কে

আমাদের আদর করিবে? বাবু ত করিতেন না, করিবেনও না। যাহা কিছু করিত আমাদের সাধের ন আইন। দশ দিক অন্ধকার করিয়া, অতল সাগরের মধ্যস্থলে ডুবাইয়া দিয়া, গহন বনের মাঝে ফেলিয়া, ন আইন কোথায় গেল? হায়! কি পরিতাপ! এ বাদ কে সাধিল! পদ্মপলাশলোচন ন আইন! তুমি কোথায় গেলে? শিশু আমরা, এ বিপদে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? (২। বক্ষে করাঘাত।)

রণরঙ্গিণী দিগম্বরী মহাকালীর পদানত, বাহ্যজ্ঞান শূন্য, ভূতপতি, আশুতোষ ভোলানাথ একবার সদয়নেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া আমাদিগকে লোক মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন; লাট লিটন আমাদের জন্য ন আইন করিয়া আমাদিগকে পদস্থ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই দিন ত্রিভুবনে আমাদের বিজয় দুন্দুভি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল তরকম্পিত হইয়াছিল, বাবুরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন। আমাদের সে গৌরব কে বিলুপ্ত করিল? আমাদের সে দিনের কে অন্ত করিয়া দিল। এ প্রাণ আর কেমন করিয়া রাখিব? ও হো! কি হইল? (৩। অশ্রুবর্ষণ)

ন আইনের বলে আমরা সাহেবের বজ্র হৃদয় কাঁপাইয়া দিয়াছিলাম। ন আইনের কৃপায় আমরা জগৎজয়ী ইংরেজের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলাম। বিনা অস্ত্রে, বিনা শস্ত্রে, নির্ব্বান্ধব যে আমরা—আমরাও রাজ্যে বিদ্রোহ করাইতে, রাজবিপ্লব ঘটাইতে, লোকের চালে চালে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে, আমাদের চিরশত্রু বাবুগণেরও মাথা মুড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এত গুণের ন আইন আমাদের কে হরিয়া নিল? (৪। দন্ত ঘর্ষণ)

যে দিন হইতে আমাদের ন আইনের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা কত উন্নতই হইয়াছিলাম! আমাদের উপর কত চক্ষুই পড়িয়াছিল! মাতৃভাষা যাহাদের পক্ষে কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তির জল স্বরূপ আতঙ্ক উৎপাদক, এমন কত কত বাবুও আমাদের নাম করিয়া, চীৎকারে গগন ফাটাইয়া বাগ্মীর যশো লাভ করিয়াছিল। যাহারা বাঙ্গলার ব জানে না এমন কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহেব, বর্ষে বর্ষে কত বিজ্ঞাপনীই আমাদের নামে লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছিল। মহামহামন্ত্রী-সম্প্রদায় গভীর রজনীতে গুপ্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের জন্য কত মন্ত্রণাই করিতেছিল। কিন্তু হায় অদ্য! অদ্য আমরা কোথায়? কাল আমরা বীর ছিলাম, সিংহের সমকক্ষ ছিলাম, আজ্ সেই আমরা কাপুরুষ, শৃগালেরও অধম! এখন কি আবার ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে! এখন কি আবার বাবুদেরও উত্তোলিত নাসার তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে? এখন কি আবার সেই অরণ্যে রোদন আরম্ভ করিতে হইবে? হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল? ন আইন, তুমি কি ছলিবার জন্য, আমাদিগকে এমনি তুলিয়া আবার ফেলিবার জন্যই আসিয়াছিলে? আদরের উৎস ন আইন! কে তোমার চাঁদমুখে পাথর চাপাইয়া দিল? হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! অহো, কি অধঃপাত! (৫। বক্ষে বঁটীর আঘাত, পতন ও মূর্চ্ছা।)

কুড়িয়ে পাওয়া।

(বর্দ্ধমানের বড়বাজারের বড় রাস্তায়, এই কবিতাটী কুড়াইয়া পাইয়াছি। ভালো অর্থ-গ্রহ করিতে পারি নাই, কিন্তু বড় ভালো লাগিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারি নাই। পাঠকগণ প্রীত হইবেন মনে করিয়া পত্রস্থ করিলাম।—— পঞ্চানন্দ)

১। কোৎথেকে হোলো।

শুনে তোমার নামের জাহির,
ভিতর বাহির,
দেখ্‌তে এলেম গুণাকর !

কর নাকি বড় কীর্ত্তি,
নিত্যি নিত্যি,
কীর্ত্তি চাঁদের কুলধর।

কত সাগর ডিঙ্গো,
গিরি লংঘো,
মাথার ঘামে ভিজিয়ে পা।

লোকে উপায় করে,
পেটের তরে,
পেট তবু ভরে কি না।

তোমার হয় না আন্‌তে,
হয় না জান্‌তে,
সুখ সাগরে ভাসিয়ে গা,

বোসে আছ ভাগ্যিমন্ত,
জল জীয়ন্ত,
পায়ের উপর দিয়ে পা।

নিয়ে গীধু বিধু চৌ চাপটে,
মজা লুটে,
খৈ ফোটাচ্ছ আট পহর,

বসিয়েছ ভূতের হাট,
আজব নাট,
আবকারিতে হারিয়ে হর।

তুমি যে গণ্ড মূর্খ,
নাইকো দুঃখু,
তাতে কারুর একটী তিল,

সে তো হবারি কথা,
এঁড়ের কোথা,
মান্‌ষের সঙ্গে হয়েচে মিল।

কিন্তু বাছা একটু কষ্ট,
তাইতে নষ্ট,
সকল দিকুটে কোরেচে,

নইলে গেলে কত অমন,
রাজার আসন,
শুধু, সেই ভয়ে লোক পেচিয়েচে।

ঐ যে টাকার ঝাঁকে,
যাকে তাকে,
বাপ্‌টি বলা শক্ত কাজ,

তা কি সবাই পারে,
বাপ্‌ রে! মা রে!
হোক্‌ না কেন মহারাজ!

কেমন মাথা তুলে,
চাইতে হোলে,
বাধো বাধো মনে হয়,

লোকের টিটকিরিতে,
দিনে রেতে,
জগৎ যেন আঁধারময়।

এতে বিদ্যে বুদ্ধি,
স্বভাব শুদ্ধি,
কার্দ্দানি কি কেরামৎ,

চাইনে তারি,
তবু কোর্‌তে নারি,
বাপের নামের মেরামৎ।

হাত যখন পাতে উঠলো,
জোরে বুদো,
পিতিকে যে ন্যায় কেড়ে,

তা, ধর্ম্ম জানে,
সয় না প্রাণে,
মিথ্যে বলে কোন্‌ ভেড়ে।

তাই বলি এই কথাটা,
এত মোটা,
মনে রাখ্‌লে ক্ষতি কি?

কোরে ধোপার পোশাক,
কোল্লে দেমাক,
লোকে বলে ছি ছি ছি।

আমার কথা বাছা,
বড় সাঁচা,
শুনে মেনে চল্‌তে হয়,

দেখ, জরির শেষে, *
উল্লু সেজে
বস্‌লে কিবা কলোদয়!

দশের কথা নেবে,
দেখ্‌বে ভেবে,
কোৎ থেকে কি হোয়েচে।

নইলে হাসবে লোকে,
তফাৎ থেকে,
কার কি খোয়ে গিয়েচে?

* শেষে—শয্যাতে।

২। হোরি।

"খেলিব সদা রঙে হোরি,
লালেলাল সব করি হো।

"নাহি বটে বৃন্দাবন,
নগরে করব বন,
যেখানে গোপিনী মিলে,
সোহি বন মোরি হো।

"সেকালে ছিনু গোপাল,
আমি, একাই এখন একটী পাল,
এখন, পালে পাল মিশিয়ে দিলে,
নিজমূর্ত্তি ধরি হো।

"নহি সে কালো কানাই,
সে সব, ব্রজনারী আর নাই,
এখন, নাই দিয়ে তুলেছে মাথায়,
আমার, কতই সুন্দরী, হো।

"গোলোকে করি বিরাজ,
নাইকো আমার লোকলাজ,
আমার লোক আছে, লস্কর আছে,
আমি কেন মরি, হো।

"আমি রে রাখালরাজ,
রাখালি আমার কাজ,
তোরা রাজসাজ খুলে নে,
তোদের পায়ে ধরি, হো।

"আমি জন্মগুণে পাই নি পদ,
কর্ম্মে করি নি সম্পদ,
তবে পদে পদে আপদ কেন,
মাথায় নিয়ে ফিরি, হো।

"আমি জানি নে রে লোকাচার,
ধারি না ধার ভদ্রতার,
তাই পাঁচ প্রকারে পাঁচ মকারে,
সদাই মজা করি, হো।

"আমি কিছু বুঝিনে,
ও সব কিছু খুঁজিনে,
সব, পুড়ে কেন হোকনা খাক,
(আমি) বাজাব বাঁশরী, হো।

"গোরাকে দিয়েছি ভার,
হরিতে ভুবনের ভার,
আরতো গৌরহরি নইরে আমি,
শুধু হোরির হরি, হো।

"ছেড়েচি সুদর্শন চক্র,
এখন, তন্ত্রবুঝে করি চক্র,
তবু কুলোপানা দেখাই চক্র,
বক্র যার উপরি, হো।

"কে জানে কার কেমন মন,
আমি ভালবাসি গোবর্দ্ধন,
শুধু হাম্বারবে সুখে ভবে,
যাই সব পাশরি, হো।

"আন্‌রে একশ আট গোপিনী,
নাচুক তারা ধিনি ধিনি,
আমার যায় যাবে সকলি যাবে,
নিব কৌপিন ডোরি, হো।

"কোথারে দাদা বলাই,
তোর মধুভাণ্ড কোথা ভাই,
এমন মধু দিনে মধু বিনে,
কেমনে প্রাণ ধরি, হো"।

৩। বিনয়

"কেন হে আমোদে মাতোয়ারা
তুলে তান কোর্‌চো গান
হৈয়ে যেন জ্ঞানহারা।

"পরের তরে মাথা ব্যথা,
হয় যদি হোক্ রোগের কথা,
তা বোলে কেননা বহিবে
পর দুখে চোখে ধারা।

"ছেড়ে অমন রাজত্ব ভোগ,
কেন এমন কর্ম্ম ভোগ,
ভুগিতে যদি ভাল লাগে,
পরকে কেন কর সারা।

"তুমি যদি মনে করো,
ত্রিভুবন তারিতে পারো,
মহিমা থাকিতে তোমার,
কেন, শিরে কলঙ্ক পসরা।

"হরিতে বিপদের ভার,
তোমার ও শ্রীপদের ভার,
কেন আর ভ্রমেছে তোমার
ভ্রমিবে দুখিনী ধরা"।

৪। রাস ; অপ্রকাশ।

" * * * * * * *

শক্ত সওয়াল।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে অনেক বাঙ্গালী ধুমধামের সহিত পিটে খায়, আর নাম দেয় "পৌষপার্ব্বন"। বঙ্গবাসী তো প্রায়ই পেটে খায় না, বারো মাসই অকাতরে পিটে খায়, তবে পার্ব্বন্ বলে না কেন?

কথায় বলে বারো মাসে তেরো পার্ব্বন; একি তাই? না কি পার্ব্বন নামে একটা ধুমধামের শ্রাদ্ধ আছে, সেইটা মনে করিয়াই পৌষপার্ব্বন বলে? অথবা, এমন হইতে পারে কি না যে পৌষ মাসে সকলকার ঘরে চার্‌টি চার্‌টি ধান হয়, বছরের মধ্যে এক বার পেট ভরিয়া খাইবার যোগাড় হয়, তাই শ্লেষ করিয়া সেই দিন পিটে খাওয়া বলে।

ফুল নম্বর ৫০। এক মাসে উত্তর দিতে হইবে।

সারগ্রাহী বাবুর গুণগ্রাহিতা।

কালেক্টরীর ঘর মেরামৎ হইতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ি, বড় বড় কপিকলের সাহায্যে তোলা হইতেছে, কত কুলী মজুর খাটিতেছে। একজন সাহেব-কুলীও সেই সঙ্গে খাটিতেছে এবং কালো কুলীদের খাটাইতেছে।

বাঙ্গালী বাবু—বেলা হইয়াছে, আফিস যাইবার তাড়া—সেই খান দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছেন। সেই সাহেব-কুলী বাঙ্গালী বাবুকে ধাক্কা দিয়া সে পথ হইতে সরাইয়া দিল, মুখে বলিল,—"ড্যাম-শালা নিগর, বাঞ্চট্ মরিয়া যাবি আর বলিবি কি সাহেব আমার পিলা ফেটিয়ে দিলে।"

কথাটী না কহিয়া রাজভক্ত, প্রভুভক্ত [বাঙ্গালী বাবু আপন গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেলেন। কতক দূর গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সাহেব তখন অনেক দূরে পড়িয়াছে। তখন আর একবার দাঁড়াইয়া, খুব আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বাঙ্গালী বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"সাহেব ত খাশা বাঙ্গলা শিখেছে।"

লাট মন্দিরের খবর।

(হাড়গিলের পাঠানো।)

জানেন ত আমি কুড়ের বেহদ্দ, আমায় আবার খবরাখবরের ভার দেওয়া কেন? আমি এই গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, অথচ দুটী পা কখনও এক সঙ্গে বার করিনে; দিন রাত জেগে থাকি, তবু দুটী চোক মেলে কখন পূরো নজরে চাইনে। লোকে মনে করে—কত জন বলেও—হাড়গিলের মত হুঁসিয়ার অথচ বিজ্ঞ লোক সংসারে আর নাই। আসল কথা আমিই জানি,—আমার মত আল্‌সে ত্রিভুবনে আর নাই।

যাই হোক, আপনি যে রকম নাছোড় বন্দা, তাতে. দুটো খবর না দিলেও, দেখ্‌ছি, আর চলে না। ফলে আমি বাইরের কিছু বল্‌তে পার্‌ব না, এই লাট মন্দিরের ভেতর যা দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই, তাই নিয়ে দু কথা যা যোগায়, বল্‌চি।

১। ব্যক্তি; লাটের দল ও মলাটের দল।

প্রথম ত দেখি খোদ লাট, নাম রিপন। লোকটা ভাল মন্দ কিছুতেই

নাই, খায় দায় মাইনে ন্যায়, এই পর্য্যন্ত। রিপন চাচা পষ্ট কবুল জবাব দিতে খুব মজবুৎ, মনের ভেতর বড় এক খান কোরকাপ নেই, দলের লোকে যেমন যেমন বোলে কোরে দ্যায় তেমনি রাজ কর্ম্ম করে। একবার একটা টিকে দেবার আইন হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল যে যে টিকে না দেবে, তার ম্যাদ হবে। রিপন চাচা আইন দেখে চম্‌কে গেল, বোল্লে তোমরা দশ জনে যা ভালো বোঝো, তাই করো, তায় আমি আপত্তি করি নে কিন্তু আইনের ব্যবস্থা শুনে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে—এতে ম্যাদ কেন? সেই হাত পা সেঁদোনোই সার, আইনটা কিন্তু জারি হোয়ে গেল।

অমনি সেদিন আবার ফৌজদুরি কার্য্যবিধির আইন হবার বেলা যতীন্দ্র ঠাকুর বল্লে যে খালাশের পর আপীল কোরে লোককে নাস্তানাবুদ করাটা ভালো নয়, কোনো রাজ্যেই এমন বেমক্কা কথা চলে না, তবে এখানে চল্‌বে কেন? চাচা—ঐ রিপন চাচা—সাদা সিদে লোক, বোলে ফেল্‌লে—আমি ওসব কিছু বুঝি সুঝি নে, দলের লোকে যা করে, করুক। আগেকার লাট যা কোরে গ্যাছে, তার উল্টো কোরতে গেলে, এক্ষুণি এরা আমায় খেয়ে ফেল্‌বে। যা হোচ্ছে, হোক। চাচার এ আক্কেলটুকু হোলো না যে আগেকার লাটের আমলে আপীলে সাজা বাড়বার নিয়ম ছিল, অথচ আজকের এই মজলিশেই সেটা উল্টে দেওয়া হোচ্চে। চাচা কিন্তু পষ্ট বোলে দিলে যে কথা গুলো শক্ত, আমি অতো ভেবে উঠ্‌তে পারি নি।

চাচার দোষই বা দি কি বোলে? ভাল মানুষের ছেলে এসেছে ত এক মগের মুল্লুকে, না জানে এ দেশের লোককে, না জানে এদের ভাষা, না জানে এদের চাল চলন, না জানে কিছু। এ হরি ঘোষের গোয়ালে—অর্থাৎ কি না এই ভারতবর্ষে—হঠাৎ যে একটা কিছু ঠাউরে ওঠা, যার তার কাজ নয়। তাই বোল্‌চি যে রিপন চাচা খায় দায়, মাইনে ন্যায়, কোনো গোলের ভেতর থাক্‌তে চায় না। তবু ভালো; "ভালো কোর্‌তে পার্‌ব না, মন্দ কর্‌ব

কি দিবি তা দে" ডেকে হেঁকে যে সেইটে করে না, এই চের।

লাটের দলে অনেকগুলো উপসর্গ আছে। তার একটা লড়াইয়ের লাট। নেহাত ষণ্ডামার্ক লোক না হোলে কেউ কাঁচা প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াইয়ের চাকরি স্বীকার করে না; তা এ লোকটা কাজে যেমন ষণ্ডামার্ক, বুদ্ধিতে ততোধিক। আসামে কুলি পাঠাবার আইন নিয়ে যখন টক্কাটক্কি হচ্ছিল, হাঁদারাম উঠে বোল্লেন কি না, আসামের চা বাগানের কুলির মত সুখী জীব ভূ ভারতে আর নাই। আমি মনে মনে ভাবলুম, যে হাঁদারামের তাই যদি মনে হোয়েচে ত এ কর্ম্মভোগ কোরে মরে কেন, আপনি গিয়ে কুলি হোলেই ত হয়। হাঁদারাম যদি কুলি হয়, তা হলে দেশের লোকের হাড় জুড়োয়, যার বাগানে হাঁদারাম খাটে তার কাজ বেশি হয়, আর হাঁদারামের খেদ টুকুও যায়। ষণ্ডামার্কের কিন্তু সে বুদ্ধিটুকু হোলো না।

আর একটা মহিষাসুর আছে, সেটার নাম বিট্‌লে ষ্টোক্‌। দরকার মত আইনের সুসবিদা করাই তার কাজ, কিন্তু বিটলে এমনি কুচক্রী, লাগুক না লাগুক, সময় অসময় না বুঝে আইন কোচ্চিই কোচ্চিই। বিটলে মনে করে যে লাট মন্দিরটে কুমোরের চাক, আর তার মগজটা কাদার তাল। সেই চাকে চাপিয়ে কেবলই পাক দিচ্ছে, আর আইন বার কোর্‌চে। আইন যা করে, তাতে বিদ্যে প্রকাশও সেই গোছের; না বেরুতে বেরুতেই তালি দিয়ে রিফু কোর্‌তে হয়। তার পর আবার সেই রিফুর রিফু, তস্য রিফু, ক্রমাগত চোলেচে। বিট্‌লে যে মাইনের টাকাগুলো মাটী কোর্‌চে, তা করুক; ঐ যে এত কাগজ, কলম, কালি নষ্ট করে, তাতেই বড় কষ্ট হয়। আমার কেবলই মনে হয় যে পঞ্চানন্দ ঠাকুর এত কাগজ কলম পেলে না জানি কি একটা কারখানাই কোরে ফেলত। শুনতে পাচ্ছি বিট্‌লে এই বার যাবে। না টেঁকলেই ভালো। যে দিন যাবে, আমি সে দিন পালক ঝেড়ে একবার হাওয়া খাবো।

এই রকম গ্রহ উপগ্রহ লাটমন্দিরে অনেক আছে। সব কটার কথা বোল্‌তে গেলে বিস্তর সময় নষ্ট হবে।

যতীন্দ্র ঠাকুর টাকুর আর আর যারা আছে, তাদের আমি গ্রহ উপগ্রহ বোলে ধরি না। তারা লাটমন্দিরে মলাট মাত্র—সোনার জলে হলকরা বেস বাঁধানো, ওপরে টাইটেলটুকু আছে কিন্তু ভেতরে সব ফাঁক; তাই তাদের মলাট বোল্‌চি। শুদ্ধ শোভার্থে তাদের নিয়ে গিয়ে লাটমন্দিরে সাজিয়ে রেখে দ্যায়, দরকার হোলে কর্ত্তারা নেড়ে চেড়েও দ্যাখেন কিন্তু ভেতরে কখনও কিছু খুঁজে পান না, সেই জন্য বোল্‌চি যে এদের ভেতরে সব ফাঁক। নইলে বিশ কোটি লোকের বেদ বোলে অমন যত্ন কোরে তুলে নিয়ে গিয়ে কাজের বেলায় অমন তুচ্ছ তাচ্ছীল্য কোর্‌বে কেন? এক দিনও দেখলুম না যে এদের কথা বিকুলো। অথচ গতি বিধি সাধ সম্মান—কিছুরই কসুর নাই। আমার মনে হয় যে এরা বড় বেহায়া লোক; নইলে পয়সা নেই, কড়ি নেই, শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই,—এসব দেখে শুনেও রোজ রোজ পরের আমোদ বাড়াবার জন্যে সঙ সাজতে যাবে কেন? আমি হোলে ত কিছুতেই যেতুম না; যেখানে আমার কথা চলে না, সে দিকে আমার পাও চলে না, এই আমার মত।

শিবপ্রসাদ নামে একটু মেড়ুয়া রাজাও এই মলাটের দলে আছে। এ একটা মানুষের মত মানুষ; সে দিন বোলে ফেল্লে যে সিবিল সাহেবের দল খুব বেশি বেশি না থাকলে দেশ চোল্‌বে না, দেশের ভারি অমঙ্গল হবে। কথা খুব পাকা। আপন মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল, সিবিল সাহেব না হোলে ছাতুখোরের সেলাম নেবে কে? কথা ঠিক, সিবিল সাহেব যখন নেই, তখন শিবপ্রসাদও নেই। সুতরাং!

২। পদার্থ; ঘটনা ও রটনা।

বিদ্যাসাগর ছেলেদের শেখান যে ইতস্তত যাহা দেখিতে পাও, তাহাই পদার্থ। সে কথা যদি ঠিক হোতো, তা হোলে রিপন চাচা অবধি ছাতুমারা মেড়ুয়া পর্য্যন্ত সবই পদার্থ হোতো। কিন্তু আমি না কি এ সব

"জলবিম্ব—তদ্রূপ প্রায়"

বিবেচনা করি, কখন আছে কখন নেই

তাই—এ সকলকে পদার্থও মনে করি না। আমার মতে এ সমস্তই অপদার্থ।

আসল পদার্থ হোচ্চে লাটমন্দিরে যা ঘটে, আর যা রটে। তারই কথা এখন কিছু বোল্‌বো।

এক ঘটনা ন আইন উঠে গ্যাছে। কেন যে উঠে গেল, কিছুই বুঝতে পাল্লুম না; লাট মন্দিরের এক পাশে ভাল মানুষের মত বোসে থাক্‌ত, মুখে কথাটী ছিল না, কোনো উৎপাত ছিল না, অথচ দশ জনে পেছনে লেগে, বেচারিকে বোকা বানিয়ে উঠিয়ে দিলে। কাজটা ভালো হয় নি। আপনি কি বলেন ? আমোদের মধ্যে এইটুকু হোয়েচে যে ন আইনের কথা নিয়ে লোকে যতীন্দ্র ঠাকুরকে যজমেনে ঠাকুর নাম দিয়েচে—কেন না, গর্ব্ভাধান, জাতকর্ম্ম ইস্তক তার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াতেই ইনি উপস্থিত থেকে মন্ত্র বোলে যজিয়ে ছিলেন। কেউ কেউ বলে মজিয়ে ছিলেন।

আর এক ঘটনা আসামের চা বাগানে কুলি পাঠাবার আইন। এই আইন নিয়ে তুমুল কাণ্ড হোয়েছিল—দলাদলি পর্য্যন্ত হোয়েছিল, একটা কুলির দল, আর একটা চাকরের দল। দেশী লোক সমস্ত কুলির দলে, আর বিদেশী সব চাকরের দলে। চাকররা জিতেচে, কুলিরা হেরেচে; এখন কুলির দল বোল্‌চে এতো আইন নয়, এ মানুষধরা কল। আমি কুলিও না, চাকরও না, কাজেই আমি এর কিছুতেই নেই।

আরও একটা ঘটনা. ফৌজদারি কার্য্যবিধি। এ সেই বিট্‌লে গুণনিধিরই বিধি, কাজে কাজেই নামে বিধি হোলেও এতে অনেক অবিধি আছে, তা বলাই বাহুল্য। এই আইন জারি হবার সময়ে লাটমন্দিরে অনেকগুলো পদার্থের সিদ্ধান্ত হোয়েচে ;—

(ক) লাট সাহেব আইন কানুনের কথা ভাব্‌বেন বলেন, কিন্তু ভেবে উঠ্‌তে পারেন না।

(খ) আগে আপীল কোরলে সাজা বাড়্‌তো, এখন আর বাড়বে না ; দলস্থ লোকের অভিপ্রায় হোলে হালের লাট সাহেব সাবেক লাট সাহেবের ব্যবস্থা রহিত করেন।

৫। উপকার,—কিন্তু কার?

এই যে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য কেবল লাভ লোকসানের উপরেই নির্ভর করে, তা অন্য বাজে লোকে জানে না বটে, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই। গোড়ায় ব্যবসা কর্‌বারই জন্যে এখানে ইংরেজদের আসা, এখনও সেই ব্যবসার ভরসাতেই তাঁদের এত কষ্ট স্বীকার কোরে রাজ্য পরিচালন। তবে দোকানদারির দায়ে জমীদারি জুট্‌লে পর যেমন সেরেস্তা আলাদা রাখতে হয়, ইংরেজরাও সংপ্রতি সেই ভাবে কাজ চালাচ্ছেন; কতকগুলি ইংরেজ খাঁটি দোকান নিয়ে থাকেন, আর কতকগুলি নায়েব, গোমস্তা—জজ মেজেষ্টর—সেজে জমীদারি সেরেস্তার কাজ আঞ্জাম করেন। কিন্তু আসলে যে বেণে, সেই বেণে; জমীদারি সেরেস্তাতেও সেই খরিদ বিক্রী, লাভ লোকসান গণনা ভিন্ন অন্য কথা নাই। রাজকার্য্যে—অর্থাৎ ঐ জমীদারি সেরেস্তায় বছর বছর হিসাব নিকাশ করা হয়, আর পর বৎসরের আয় ব্যয়েরও একটা ফর্দ্দ তৈয়ের হয়। এই হিসাব নিকাশ করা ফর্দ্দ তৈয়ের করাকে বজেট বলে; বজেট লাটমন্দিরেই হয়,—আমি সেই বজেটের কথাই বল্‌তে বোসেছি।

বছর বছর হয়, এবারও বজেট হোয়েচে; বছর বছর সেই আফিঙ বিক্রী, সেই ষ্টাম্প বিক্রী, ইংরেজ আমলাদের মেহনৎ বিক্রী, বিচার বিক্রী, ধর্ম্ম বিক্রী——ইত্যাদি নানা রকম জিনিশ বিক্রী হোয়ে থাকে, এবারও হোয়েছে। তবে বজেটে কেবল সোতেনের ধরণে মোটামুটি টাকার অঙ্ক গুলো ধরা হয় মাত্র, বিশেষ খোলাশা কিছু থাকে না। যেমন, বিচার খরিদ করাতে রামা চাষার সর্ব্বস্ব গ্যাছে, রাজারাম রায়ের ঘরে এত টাকা দেনা প্রবেশ কোরেচে——এ রকম কোনও ব্যাওরা বজেটে পাওয়া যায় না। তা অন্য বছরও থাকে না, এবারও ছিল না। ফলে এ সব পুরাণো কথার হিসাবে বজেটের কথা না বল্‌লেও চল্‌ত। কিন্তু এবার নাকি একটু বিশেষ খবর আছে তাই লিখতে হোচ্চে। আর সেই বিশেষ কথা গুলো লোকে বুঝ্‌তে পারবে বোলে এত টা ভূমিকাও কোরতে হোলো।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত

বিচি; আমারও আসল কথা চেয়ে ভূমিকা বড়। তা করি কি? যা না বোল্লে নয়, তা না বোলেই বা থাকি কি কোরে?

নুনের কাটতি বাড়াবার জন্যে নুনের দর কমিয়ে দেওয়া হোয়েছে। এতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দুই হবে। নুনের মহাজনরা বড় জোচ্চোর; ব্যবসা করে কিন্তু সরকার বাহাদুরকে ফাঁকি-দেবার চেষ্টাটা বিলক্ষণ আছে—পূরো লাইসেন্সি দিতে কিছুতেই চায় না। এবার তেমনি জব্দ! সাবেক দরে গাদা গাদা নুন কিনে রেখেছিল আর লাভ কোরে বড় মানুষ হবে ভেবেছিল। মুখে ছাই পোড়েছে—নুনের দর কম হওয়াতে একেবারে গোল্লায় গ্যাছেন। কেমন, দুষ্টের দমন হোলো কি না?

শিষ্টের পালনও তেমনি। যে দশ টাকা রোজকার করে, কি যার বাপের দশ টাকা আছে সময়ে অসময়ে চাঁদাটা আসটা দেয়—সেই ত শিষ্ট। তা স্বচ্ছন্দে এখন পৌনে সাত পয়সার নুন সাড়ে পাঁচ পয়সায় পাবে। এরা এখন চার পা তুলে রাজাকে আশার্ব্বাদ কোরবে আর অনায়াসে নুনের পয়সা বাঁচিয়ে তাতে তেল কিনে হর্ত্তা কর্ত্তাদের মন যোগাতে পারবে। তবেই দেখ শিষ্টের পালন টাও হোলো। লাভের অঙ্কেও দু পয়সা এলো।

আর দিনে বাউরি, বিন্দে দুলে, হলা ক্যাওরা—এরা কি মানুষ তাই এদের জন্যে মাথা ঘরাতে হবে? ব্যাটারা এক দমে আধ পয়সার বেশি নুন কিনবে না, তা রাজার দোষ কি বলো? এরা নেহাৎ পাজি; এমন পাজি লোকের কথায় থাকতেই নেই।

আর এক কাণ্ড হোয়েচে, কাপড়ের মাসুল উঠে গ্যাছে। এখন দেদার কাপ-ড়ের আমদানি হবে দেদার টাকার রপ্তানি হবে। তা হলেই বাণিজ্য, আর বাণিজ্য হোলেই লক্ষ্মী! বোকা তাঁতির বিনাশ, বুদ্ধিমন্ত সদাগরের জন্যে পাটের চাষ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বোঝা গেল যে ভারতের এবার উপকার। তবে লোকে বোঝে না, এই যা। তারা বলে কি—শুনলেও হাসি পায় —তারা বলে যে বিলিতি কাপড়ে আমা-

দের তাঁতি কুল গেল, আর বিলিতি মদে বোষ্টম কুল গেল; এখন আমরা দুয়ের বার। শোনো এক বার কথাটা!

এমন যে বজেট, মূর্খ লোকে একেই বলে———বজ্জাতি।

বিনাশ নয়, নাস।

ব্রাণ্ডী জমাইয়া এক জন ফরাসী ব্রাণ্ডীর ডেলা তৈয়ার করিতেছে। যাঁহারা মদের বিনাশ হইবে মনে করিতেন তাঁহারা এখন দেখিবেন যে মাতালেরা মদের নাস করিতেছে। অহো!

সন্ধান।

"এখন রাজা কোথায় হে?"

"চিড়িয়া খানায় গ্যাছেন।"

"সেখানে এখন কেন?"

"কি একটা জানোয়ার পালিয়ে গিয়েছে, সেই জন্যে।"

"শীগ্‌গির ফির্‌বেন ত?"

"সন্ধান না হ'লে ত নয়।"

পঞ্চানন্দের নিলামি আড্ডা।

আমরা বলি দিলাম।
তোমরা বলো নিলাম।
নিলাম! নিলাম! নিলাম!!!
উঁচু দর যার,
জিনিশ হবে তার।
আগামী চৈত্র সংক্রান্তির পর,
শুভ বৈশাখের পূর্ব্বে,
দুপুর বেলায়
গাড়ি-খানার সামনে,
গুলির আড্ডার পাশে
শুঁড়ির দোকানের কাছে
বর্দ্ধমান রাজ পবলিক লাইব্রেরির
(যেখানে সংপ্রতি
পঞ্চানন্দের নিলামি আড্ডা
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)
প্রকাশ্য নিলামে, সর্ব্বোচ্চ দরে,
ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে
তালিকার মাল।

১ নং লাট।

বাঙ্গালা ভাষা, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত, মাঝে মাঝে ইংরেজীর বুকনি

'দেওয়া, মায় বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল, " বিধাতার ভুল " ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম। অতি সুশ্রাব্য, সুদৃশ্য ও সুখাদ্য। সর্ব্বাংশে মদমত্ত বাবুকুলের উপযোগী।

(সম্পত্তি একজন বাবুর, যিনি সাহেব বাড়ীতে মর্দ্দা সাহেব, মেম সাহেব, খানশামা সাহেব প্রভৃতিকে তেলের যোগান দিতে চলিয়া গিয়াছেন।)

২ নং লাট।

মা ঠাকরুণের টেঁটি, বাবার থান-কাড়া, নিজের কালাপেড়ে শান্তিপুরে-ধুতি ও ঢাকাই উড়ুনি ও পিরাণ। প্রকাশ থাকে যে মেগের শাড়ী খানি থাকবে, নিলাম হবে না।

(সম্পত্তি জনৈক ভদ্র বাঙ্গালীর, যিনি রেলে যাইতেছেন।)

৩ নং লাট।

এক চাপকান (তালি দেওয়া, কিন্তু নূতনেরই মত), এক চোগা (কিছু কশা-কশি), এক মখমলের টুপি (হাঁড়ির ভিতর গুঁজে রাখার দরুণ যৎসামান্য বেখাপ গোছ, কিন্তু অল্প দিনের খরিদা), এক পাৎলুন (বোতাম নাই), এক যোড়া মোজা (গোড়ালি ছেঁড়া), এক যোড়া জুতা (ঠন্ ঠনের ডবল ইস্পিরিৎ বার্ণিশ্-চটা), এক ছড়ি (পিচের), এক ঘড়ী (অচল), এক ছড়া চেন (গিলটি করা)

(সম্পত্তি জনেক বাঙ্গালী বাবুর, যিনি রেলের গাড়ী থেকে নামিয়া গিয়াছেন।)

৪ নং লাট।

একটা মলবাহ কমোড (ঢাকুনি ছাড়া), নূতন খবরের কাগজ (গোসল খানার), এক যোড়া বিলিতি জুতোর তলা (পেরেক মারা), একটা পিতলের গলা-বন্দ (পোষা কুকুরের গলায় দিবার), এক ছড়া শিকলি (ঐ কুকুরের, এখন খণ্ড খণ্ড করিলে ঘড়ীর চেন হইতে পারে।)

(সম্পত্তি এক সাহেবের, যিনি বদলি হইয়াছেন। জমীদারের পুষ্যিপুত্র উপাধিগ্রস্ত উকীল, এবং অপরাপর বড় লোকের পছন্দসই জিনিশ।)

৫ নং লাট।

ঝাঁটা (মুড়ো), দড়ি (দেড় হাত) কলসী (কিঞ্চিৎ কানাভাঙ্গা)

(খোদ পঞ্চানন্দের সম্পত্তি, অন্য লাটের গ্রাহককে অমনি দেওয়া যাইবে।)

ভাষারহস্য।

নবীন সহবর্ত্তী "বঙ্গবাসী" সময়ে সময়ে বঙ্গবাসীর উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্থলে ২৮শে জ্যৈষ্ঠের কাগজ হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের প্রতি তাঁহাকে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিতেছি ;———

" এই গৌরচন্দ্রিকা করিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন যে ইহার জয়যুক্ত হইবার পক্ষে অনেক বিপদ আছে, সেই সকল বিপদ এবং তাহার নিবারণোপায় যদি আমরা দেখাইয়া দেই, তাহা এই জন্য নহে যে ইহার প্রতি আমাদিগের বিরাগ বা সহানুভূতির অভাব রহিয়াছে ; কিন্তু তাহা এই জন্য যে, আমরা বিশ্বাস করি বন্ধু ভাবে সমালোচনা করাই ইহার উৎকৃষ্ট অভ্যর্থনা।"

বলি, এ কি বাঙ্গলা ?

পঞ্চানন্দ অনুভব করিতেছেন আপনা আপনি বাধ্য, যদিও অনিচ্ছা পূর্ব্বক, প্রতিবাদিতে বিরুদ্ধে এই বর্ব্বরতার, নহে যে হেতু তিনি ভাল বাসেন বঙ্গবাসীকে অল্পতর, কিন্তু যে হেতু তিনি ভাল বাসেন বঙ্গভাষাকে অধিকতর।

স্ত্রীস্বাধীনতা।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

কামিনী সুন্দরী বসু বিকাল বেলায় আফিস হইতে বাসায় আসিলেন। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় এক খানা চেয়ারে পা ঝোলাইয়া বসিলেন। তামাক সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী সুন্দরী বসুর হাতে তুলিয়া দিল, তিনি মৃদুমন্দ ভাবে টানিতে লাগিলেন। এ দিকে মেনকা সেই অবসরে জুতা যোড়াটী মোজা যোড়াটী খুলিয়া লইল, চটী জুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বক্ষ ছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া শাড়ী খানি হাতে করিয়া সসম্ভ্রমে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাকের আশ মিটিলে, কামিনী সুন্দরী বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাড়ী খানি মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিলেন। অন্দরের এক ছোঁড়া চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস ধুইতে যাইতেছিল, কামিনী সুন্দরীকে দেখিয়া কোঁচার আঁচলাটা মাথায় টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখ হাত ধুইয়া কামিনী সুন্দরী বসু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কামিনী সুন্দরীর যৎসামান্য বাহির-ফটকা রোগ ছিল! তা থাকুক, কিন্তু পরিবারের প্রতি তাঁহার অযত্ন ছিল না। আফিসের ফেরত রোজকারের টাকার অধিকাংশই বাটীর ভিতর গিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে দুটা খোসগল্প করিয়া দিবসের অবসাদ নষ্ট এবং অর্দ্ধাঙ্গের মন তুষ্ট করিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহাতেই আহ্লাদে অধীর।

কামিনী সুন্দরীর পরিবার একহারা, গৌরবর্ণ, দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটী। তাঁহার সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেখাঙ্কের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লতাইয়া পড়ে নাই, হরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই, মাথার আলবর্ট কাটা টেড়ি কোঁচার কাপড়ে অর্দ্ধাবৃত। পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনী সুন্দরী আদর করিয়া তাহাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকেন। ভগ্নী—কামিনী সুন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্‌ভ হয়, ভৈরব সেরূপ নহেন। কামিনী সুন্দরী বসুর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে সেটী যে সপত্নির কন্যা, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—ভৈরব এমনি শান্ত এমনি সৎস্বভাব, এমনি স্নেহময়। এ হেন ভৈরবকে কামিনী সুন্দরী বসু ভাল বাসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অদ্য দশ অঙ্গুলে দশটা হীরার আঙটি, হাতে চুড়ি, বালা, গলায় চিক, কোমরে সোণার চন্দ্রহার, আরও (নাম জানি না) কত কি অলঙ্কার সুকোমল শরীরের নানা অঙ্গে পরিয়া, জল খাবারের থালা সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরব বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনী সুন্দরী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন—“কি ভগ্নী; আজ যে বড় বাহার দেখচি! শরীরটে বাঁধা দিয়েছি, প্রাণটা কেড়ে নিয়েচ, এখন কি নেবে?”

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃদু হাস্যে

ভুবন ভুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন —"প্রাণনাথিনি! আমার বাহার ত তোমারই নিমিত্তে। আমায় যত দিন তুমি ভাল বাসিবে, যত দিন তোমার অনুগ্রহ থাকিবে তত দিনই আমার বাহার। এখন সাহস আছে, ভাল বাস, তাই এ বাহারও আছে; বারণ কর, আর বাহারও করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের চক্ষু যেন ছলছল করিয়া আসিল।

কামিনী সুন্দরী তখনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি ছি ভয়! আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে ও কথা বল্লুম! রোজ রোজ এমন সাজ গোজ দেখি না, সেই জন্যেই রহস্য করে' একটা কথা বল্লুম! তুমি আমার উপর রাগ করলে?"

পত্নীর সোহাগে কোন্ সাধু পতির মন না গলিয়া যায়? ভৈরব পরিহাসের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"তোমার মন বুঝিবার জন্য অমন করিলাম, তাহাও তুমি বুঝিলে না! আজ ও বাড়ীর দাদা একবার দেখা কর্‌তে চেয়েছেন, তাই মনে করেছি যে তুমি যদি বল, তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে' আসি"।

কামিনী সুন্দরী বসুর ইচ্ছা নয় যে এমন সময়ে ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভৈরবকে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈর্ষ্যা ছিল না এমন কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ভৈরবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন—"তোমাদের বৌয়ের স্বভাবটা বড় খারাপ হোয়ে যাচ্ছে। সে দিন মন্দাকিনীদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে কি ঢলাঢলিটেই না কর্‌লে? আবার শুন্‌চি যে মেছোবাজারের জীবনকৃষ্ণের বাড়ীও যাতায়াত আরম্ভ করেচে, কেউ কেউ বলে তাকে বাঁধা রেখেচে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।" অদ্যই সন্ধ্যার পর জীবনকৃষ্ণের বাড়ীতে কামিনী সুন্দরী বসু এবং তাঁহার ইয়ারিণীদের যে মজলিস হইবার কথা আছে, ভৈরবকে তাহা আর বলিলেন না। হয় ত, পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনি ও কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন,

না। দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামিনী সুন্দরী বসুর মনে ঈর্ষ্যা ছিল; কেন, বলা যায় না, কিন্তু আজি সেই ঈর্ষ্যা সন্দেহে পরিণত হইল। ভাল করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনী সুন্দরী বসু তাড়াতাড়ি বাহির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময়ে ভৈরবের চক্ষের জলধারা ভৈরবের কপোল দেশ অভিষিক্ত করিতেছে দেখিয়া আসিলেন; তাহাতে চিত্ত আরও উদ্‌ভ্রান্ত হইল।

পাঠ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তার অবসান না হইয়া বাহুল্যই হইতে লাগিল। তখন সেই খানসামানী মেনকাকে ডাকিলেন। মেনকা মনের গতি জানিত, সুরা পূর্ণ ডিকাণ্টার, গেলাস, জল, বরফ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটী না কহিয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুষ্ট লোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গণ্ডূষ আপন গলায় না দিয়া আনিত না, এবং গন্ধের আশঙ্কাতেই কথা কহিত না। কিন্তু সে দুষ্ট লোকের কথা। যে কালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানশামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

দুই গেলাস মদ ক্রমে ক্রমে কামিনী সুন্দরী বসুর উদরে গিয়া পড়িল, তাহার পর নিজ গুণে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া দুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল।

তখন কামিনী সুন্দরী বসু কয়েক বার দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া, তাহার পর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে "জীবন কৃষ্ণ নাচে ভাল" এই কথা কয়টী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠিকে! কামিনী সুন্দরী বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই—(উচ্ছন্নে?)

(ক্রমশঃ)

——:——